সাহিত্য মালঞ্চ

মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য সংকলন

নবম শ্রেণি

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

প্রকাশনা : রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষৎ, ত্রিপুরা

সাহিত্য মালঞ্চ

মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য সংকলন

নবম শ্রেণি

গ্রন্থস্বত্ব : ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৬
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১৭
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০২০

প্রকাশক : অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষৎ, ত্রিপুরা

সংকলন ও সম্পাদনা : **শ্রী শংকর বসু**
ড. গীতা দেবনাথ
ড. স্মৃতি চক্রবর্তী
ড. নারায়ণ ভট্টাচার্য
ড. শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায়
ড. স্বপন কুমার পোদ্দার
শ্রী নারায়ণ চন্দ্র শর্মা
শ্রী অনাদি চৌধুরী

প্রচ্ছদ ছবি : শ্রী কমল মিত্র

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

ভারতের নাগরিকের মৌলিক অধিকার

(ভারতের সংবিধান, ধারা ১৪-৩০, ৩২ ও ২২৬)

সাম্যের অধিকার :

- আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে;
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারীপুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।
- সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার।
- অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ এবং আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ।
- উপাধি গ্রহণ ও ব্যবহারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

স্বাধীনতার অধিকার :

- বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার।
- শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার।
- সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার।
- ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার।
- ভারতের যে-কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার।
- যে-কোনো জীবিকা, পেশা বা ব্যবসাবাণিজ্য করার অধিকার।
- জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার :

- কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়, বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না।
- চোদ্দো বছরের কমবয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার :

- সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও সমান নিরাপত্তা, কাউকে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করা হবে না এবং প্রত্যেকেই ধর্মাচরণের পূর্ণ এবং সমান অধিকার পাবে।
- রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম, জাতি বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না।
- ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার :

- ভারতের যে-কোনো নাগরিকের নিজ নিজ ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার অধিকার রয়েছে।
- ধর্ম, জাতি বা ভাষার দরুন কাউকে সরকারি অথবা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।
- প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার :

- মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে — প্রয়োজনে বিশেষ লেখ (Writ) জারি করতে পারবে;

  হেবিয়াস কর্পাস (Habeas Corpus), ম্যান্ডামাস (Mandamus), সারশিয়ো (Certiorari), প্রহিবিশান (Prohibition), ও কুয়ো ওয়ারান্টো (Quo-Warranto)।

মৌলিক কর্তব্য

(ভারতের সংবিধান, ধারা ৫১এ)

- সংবিধানের প্রতি আনুগত্য, সাংবিধানিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ।
- মহৎ যেসব আদর্শ স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করেছে তাদের লালন ও অনুসরণ।
- ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতি রক্ষা।
- আহ্বান এলে দেশরক্ষা ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা।
- ভাষা-ধর্ম-অঞ্চল-শ্রেণি নির্বিশেষে ভারতের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যচেতনা ও ভ্রাতৃত্ববোধ উদ্‌বোধন।
- দেশের মিশ্র সংস্কৃতির মূল্যবান উত্তরাধিকারের মাহাত্ম্য উপলব্ধি ও সংরক্ষণ।
- অরণ্য, হ্রদ, নদনদী, বন্যজীবনসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাণীজগতের প্রতি সহানুভূতি পোষণ।
- বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবতাবাদ, অনুসন্ধান ও সংস্কারের বিকাশ।
- সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা ও হিংসা পরিহার করা।
- জাতি যাতে নিয়ত তার কর্মোদ্যম ও সাফল্যের উচ্চতর স্তরে পৌঁছোতে পারে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রয়াসে উৎকর্ষের সেই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর প্রচেষ্টা।
- পিতা-মাতা / অভিভাবকের দায়িত্ব ৬-১৪ বছর বয়স্ক শিশুদের শিক্ষার সুযোগের ব্যবস্থা করা।

সত্যমেব জয়তে

প্রসঙ্গত

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের পর ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নবম শ্রেণির প্রথম ভাষা 'বাংলা'র পাঠ্যপুস্তক 'সাহিত্য মালঞ্চ' প্রকাশ করল। ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান অর্জিত হয় ভাষার মাধ্যমে। ভাষার মাধ্যমেই ঘটে চিন্তন ও তার প্রকাশ। তাই ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত থাকে মানুষের বিকাশের ধারা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং কাজকর্মের গতি ও দক্ষতা। বিদ্যালয়-শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ তাই জাতীয় স্তরের সঙ্গে সংগতি রেখে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ এবং স্বকীয়তা বজায় রেখে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করেছে।

বাংলা সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন সময়কালের বিভিন্ন ধারার মননশীল ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে তাদের চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে 'সাহিত্য মালঞ্চ'-এ বিভিন্ন বিষয় ও আঙ্গিকের কবিতা, গদ্য, প্রবন্ধ ও ছোটোগল্প সংকলিত হয়েছে। এই রচনাবলি বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের সাক্ষী। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টিশীল রসবোধ, মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজচেতনা সঞ্চারিত হবে। সেই সঙ্গে জাগ্রত হবে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ।

এই পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত রচনাবলির আনুপূর্বিক বানান সমতা বজায় রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধিকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। 'সাহিত্য মালঞ্চ' সংকলনের জন্য যে সকল লেখক বা স্বত্বাধিকারী আমাদের অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যাঁদের সম্মতি এখনও আমাদের কাছে

এসে পৌঁছায়নি, আশা করি তারা বৃহৎ জাতীয় প্রকল্পে সম্মতি দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

সর্বপ্রকার দায় ও দায়িত্বের পরিধির মধ্যে থেকে 'সাহিত্য মালঞ্চ' পাঠ্যপুস্তকটি নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর পক্ষ থেকে আমি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই পুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষৎ, ত্রিপুরার অধিকর্তা আমাদের কৃতজ্ঞভাজন হয়েছেন।

সব কাজেরই অধিকতর উৎকর্ষ সাধন সম্ভব। নবম শ্রেণির 'সাহিত্য মালঞ্চ' সংকলনটি সমৃদ্ধ হয়েছে এমন দাবি করার অবকাশ নেই। ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সংকলনগ্রন্থে কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। প্রকাশিত পাঠ্যবইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগীদের মতামত ও সুচিন্তিত পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। সর্বশেষে, সংকলনটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেই আমাদের এই প্রয়াস সর্বতোভাবে সার্থক হবে বলে মনে করি।

মিহিরকান্তি দেব

আগরতলা
ডিসেম্বর, ২০১৭

(মিহিরকান্তি দেব)
সভাপতি
ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

সূচিপত্র

কবিতা :

লবকুশের যজ্ঞাশ্ব বন্ধন *	কৃত্তিবাস ওঝা	১১
বঙ্গ মাতা *	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩
বসন্তাগমে	কামিনী রায়	১৪
ঝিঙে ফুল *	কাজী নজরুল ইসলাম	১৫
দেশ	জসীমউদ্দিন	১৭
জনম দুখিনির ঘর	অরুণ মিত্র	১৯
যুদ্ধের বিরুদ্ধে	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২১
স্বপ্নে দেখা ঘরদুয়ার	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	২২
ছাড়পত্র *	সুকান্ত ভট্টাচার্য	২৩
যেখানেই থাকি না কেন	সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন	২৪
একুশ *	অনিল সরকার	২৫

গদ্য :

প্রফুল্ল *	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৭
ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে	জগদীশচন্দ্র বসু	৩১
ছুটির দেশ *	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৬
হাম্বির	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৯
অচেনার আনন্দ *	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৪
প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চা	সত্যেন্দ্রনাথ বসু	৫৮
ম্যাজিক লণ্ঠন	অন্নদাশংকর রায়	৬২
গাছ	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	৬৬
আগরতলার ইতিবৃত্ত	রমাপ্রসাদ দত্ত	৭৪
আদিবাসী ত্রিপুরি সমাজের পূজা উৎসব *	বিজয়কুমার দেববর্মন	৭৮

ছোটোগল্প :

ইচ্ছাপূরণ *	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৪
মাস্টার মহাশয়	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৯১
অভাগীর স্বর্গ *	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৯৯
দুর্ঘটনা	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	১১০
বুড়া দেবতা এবং মাচাং	ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য	১১৫

একপদীকরণ : নির্বাচিত ৮০টি * ১১৯

* চিহ্নিতকরণগুলি পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত।

লবকুশের যজ্ঞাশ্ব বন্ধন

কৃত্তিবাস ওঝা

ত্রৈলোক্য বিজয় যজ্ঞ বড়ো পরিপাটি।
আতপ তণ্ডুলে হোম করে কোটি কোটি।।
লক্ষ লক্ষ শুভ্র বস্ত্র ব্রাহ্মণের হাতে।
ইন্দ্র যম বরুণ সে যজ্ঞ চারিভিতে।।
প্রায় যজ্ঞ সমাপন হয় এই ক্ষণে।
দৈবের নির্বন্ধ ঘোড়া গেল সে দক্ষিণে।।
তুরগ পবনবেগে করিল প্রয়াণ।
উপস্থিত হইল বাল্মীকি মুনি স্থান।।
যে দিন যা হবে তাহা মুনি সব জানে।
লব কুশ দুই ভায়ে ডাক দিয়া আনে।।
মুনি বলে লব কুশ শুনহ বিশেষ।
তপস্যা করিতে যাই চিত্রকূট দেশ।।
তপোবন রক্ষা করো ভাই দুইজন।
তথায় বিলম্ব মম হবে বহুদিন।।
করো সঙ্গে না করিহ বাদ বিসংবাদ।
মুনি সব জানে যত পড়িবে প্রমাদ।।
প্রণাম করিল দুই ভাই করপুটে।
শিষ্যগণসহ মুনি গেল চিত্রকূটে।।
বারো শত শিষ্যসহ গেল মুনিবরে।
দুই ভাই খেলাখেলি বেড়া দণ্ড করে।।
ধনুর্বাণ হাতে দুই ভাই খেলা খেলে।
মৃগ পক্ষী সব বিন্ধে বসি বৃক্ষতলে।।

সন্ধান পুরিয়া দুই ভাই এড়ে বাণ।
দেশ দেশান্তরে বাণ ভ্রমে স্থানে স্থান।।
নদ-নদী বিন্ধে আর বিন্ধে যে পর্বত।
একদিনে যায় বাণ ছয় দিনের পথ।।
ষট্‌চক্র বাণ যে বেড়ায় দেশে দেশে।
লক্ষ লক্ষ মৃগ মারি পুন তূণে আসে।।
এমন বাণের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে।
কেবা শিখাইল বাণ কোথা হৈতে জানে।।
দুই ভাই বৃক্ষতলে নানা খেলা খেলে।
হেনকালে অশ্ব এল সে গাছের তলে।।
ঘোড়া দেখি হরষিত হৈল দুইজন।
হেমপত্র তার ভালে দেখিল লিখন।।
রাজা দশরথের জনম সূর্য বংশে।
তিনি সত্য পালিয়া গেলেন স্বর্গবাসে।।
তাঁর পুত্র রঘুনাথ ভুবন ভিতরে।
অযোধ্যায় রাজ্য করে চারি সহোদরে।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন।
অশ্বমেধ শ্রীরাম করেন আরম্ভন।।
সে অশ্বমেধের অশ্ব রাখে শত্রুঘন।
দুই অক্ষৌহিণী ঠাট তাহার ভিড়ন।।
জয়পত্র দেখি দুই ভাই কোপে জ্বলে।
সাহস করিয়া ঘোড়া বান্ধে বৃক্ষমূলে।।
দুই অক্ষৌহিণী ঘোড়া না পারে রাখিতে।
হেন ঘোড়া দুই ভাই বান্ধে ভালোমতে।।
ঘোড়া বান্ধি মার কাছে গেল দুই জন।
মিষ্ট অন্ন আদি দোঁহে করিল ভোজন।।

বঙ্গমাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষে হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি—তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।
দেশদেশান্তর—মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালো মন্দ-সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষীছাড়া করে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে—মানুষ করনি।।

বসন্তাগমে

কামিনী রায়

বসন্ত কি সহসা এ নির্জন আবাসে
পশিয়াছ চুপি চুপি? নবীন পল্লবে
সাজিয়াছে তরুরাজি। ঝেড়ে দিলে কবে
পুরাতন জীর্ণপত্র? শীতল বাতাসে
বাতাবি ফুলের গন্ধ ধীরে ভেসে আসে
আমার গবাক্ষপথে; ঘন কুহুরবে
মুখরিত আম্রবন,—বসন্তই হবে।
উদ্যান উজ্জ্বল শত শ্বেত পুষ্প হাসে।

আজিও ধরণি মোরে রেখেছ ধরিয়া
তার স্বর্ণ কারাগারে। বর্ণ গন্ধ গানে,
রসে স্পর্শে দিতে চাহে দেহে আর চিতে
নব প্রাণ, কিন্তু হায় নিঃশেষে ভরিয়া
কই দিতে পারে, মধু? দূরে কোন্‌খানে
থাকে অদেহীরা, বঁধু, পারো বলে দিতে?

ঝিঙে ফুল

কাজী নজরুল ইসলাম

ঝিঙে ফুল ! ঝিঙে ফুল !
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে ফুল—
ঝিঙে ফুল!

গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলে দুল—
ঝিঙে ফুল!

পাতার দেশের পাখি বাঁধা হিয়া বোঁটাতে,
গান তব শুনি সাঁঝে তব ফুটে ওঠাতে।

পউষের বেলা শেষ
পরি জাফরানি বেশ
মরা মাচানের দেশ
করে তোল মশগুল—
ঝিঙে ফুল।।

শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকু রে,
আলুথালু ঘুমু যাও রোদে গলা দুকুরে।

প্রজাপতি ডেকে যায়—
'বোঁটা ছিঁড়ে চলে আয়!'
আসমানে তারা চায়—
'চলে আয় এ অকুল!'
ঝিঙে ফুল।।

তুমি বলো—'আমি হায়
ভালোবাসি মাটি-মায়,
চাই না ও অলকায়—
ভালো এই পথ-ভুল।'
ঝিঙে ফুল।।

দেশ

জসীমউদ্দীন

খেতের পরে খেত চলেছে, খেতের নাহি শেষ
সবুজ হাওয়ায় দুলছে ও কার এলো মাথার কেশ।
সেই কেশেতে গয়না পরায় প্রজাপতির ঝাঁক,
চঞ্চুতে জল ছিটায় সেথা কালো কালো কাক।
সাদা সাদা বক—কনেরা রচে সেথায় মালা,
শরৎকালের শিশির সেথা জ্বালায় মানিক আলা।
তারি মাথায় থোকা থোকা দোলে ধানের ছড়া,
মার আঁচলের পরশ যেন সকল অভাব-হরা।
সেই ফসলের আসমানিদের নেইকো অধিকার,
জীর্ণ পাঁজর বুকের হাড়ে জ্বলছে হাহাকার।

বনের পরে বন চলছে বনের নাহি শেষ,
ফুলের ফলের সুবাস ভরা এ কোন্ পরির দেশ?
নিবিড় ছায়ায় আঁধার করা পাতার পারাবার,
রবির আলো খণ্ড হয়ে নাচছে পায়ে তার।
সুবাস ফুলের বুনোট করা বনের লিপিখানি,
ডালের থেকে ডালের পরে ফিরছে পাখি টানি।
কচি কচি বনের পাতা কাঁপছে তারি সুরে,
ছোটো ছোটো রোদের গুঁড়ো তলায় নাচে ঘুরে,
মাথার পরে কালো কালো মেঘরা এসে ভেড়ে,
বুনো হাতির দল এসেছে আকাশখানি ছেড়ে।

এই বনেতে আসমানিদের নেইকো অধিকার,
জীর্ণ পাজর বুকের হাড়ে জ্বলছে অনাহার।
নদীর পরে নদী গেছে নদীর নাহি শেষ,
কত অজান গাঁ পেরিয়ে কত না-জান দেশ।
সাত সাগরের পণ্য চলে সওদাগরের নায়,
সুধার ধারা গড়িয়ে পড়ে গঞ্জ-নগর ছায়।
চখায় মুখর বালুর চরা হাসে কতই তীরে,
ফুলের বনে রঙিন হয়ে যায় বা কভু ধীরে;
কত মিনার—সৌধ চূড়ার কোল ঘেঁষিয়া যায়,
কত শহর হাট-বন্দর-বাজার ফেলে বায়।
কত নায়েব ভাটিয়ালির গানে উদাস হয়ে,
নদীর পরে নদী চলে কোন্ অজানায় বয়ে।
সেই নদীতে আসমানিদের নেইকো অধিকার,
জীর্ণ পাঁজর বুকের হাড়ে জ্বলছে হাহাকার।

জনম দুখিনির ঘর

অরুণ মিত্র

দুব্বার কয়েকটা ছোপ
ধানের গুচ্ছের একটু ছটা
কয়েকটা দোয়েল ফিঙে টুনটুনি
নরম হাসির আভা
দু-একজনের ঠোঁট আদর করার মতো খোলা
এই সব নিশানা ধরেই
এখানে ফিরেছি আমি।

দুরন্ত রোদের টিলা পেরিয়ে এলাম,
কুয়াশা প্রান্তর বনবাদড়ের রাত
আমায় ঘোরায়নি আর,
অচেনা হাটুরে আনাগোনা ক্রমে ক্রমে মুছে গেছে,
নানান জিজ্ঞাসাবাদ বিচিত্র ভাষার স্তূপ ঠেলে
এখন আমার কান শুদ্ধ এক ধ্বনিতে পেতেছি।

সেই পিদ্দিমের আলো দেখা যায়,
জনম দুখিনির ঘর।
কবে আমি বড়ো হয়ে তাকে ছেড়ে চলে আসি
তবু তার আঁচলের হাওয়া আজও আমার নিভৃতে,
ঘুমের সময় যত গল্প ছিল আমাদের
অন্ধকার ভরাতো যা সবই সে তো রূপকথার,
তবু দুঃখ ঘোচানার গোপনতা নিয়ে
গল্পের রাতের মধ্যে অভিভূত আমরা ঘুমোতাম।

তারপর একদিন বেরিয়েছি,
সন্ধ্যার সীমান্তজোড়া পাহাড় ডিঙিয়ে
কতদূর চলে গেছি,
বিভুঁই মনের মধ্যে পথ খুঁজে কতবার দিশেহারা,
রূপকথার কোনো দেশ দেখিনি তো।
আজ দুব্বা ধান পাখি দেখে
ভালোবাসার দু-একটা মুখ দেখে
এখানে ফিরেছি।

পিদ্দিম জলার একলা ঘর,
ওই আলো অন্ধকার ঘর আমার নাড়িতে বাজে,
আমার শ্রবণ একক স্বরের স্থিতি পায় :
ভাঙাচোরা বুড়ি গলা
বিশুদ্ধ অতল স্পর্শ,
ঘরে ফিরতে বলে ডাকে।
সলতেটা নেভার পরও এই ডাক ঘুরতে থাকবে
যতক্ষণ না আমি
রাত্তিরের গল্পগুলো মনে চেপে
আবার দাঁড়াব গিয়ে দুঃখের দুয়োরে।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চলো আমরা চাঁদের দেশে যাই
চলো আমরা সময় থাকতে যে যার দেশের জাতীয় পতাকা
চাঁদের দেশের সবার চাইতে উঁচু পাহাড়টার
চূড়ায় দিই উড়িয়ে, তার মাটিকে করি সোনার চেয়ে দামি।

পৃথিবীতে কোথাও আর নদী পাহাড় আকাশ
কোথাও আর ঘুমিয়ে থাকার ছ-ফুট জমি নেই।
একটি পাখির বাসা গড়ে তোলার মতো সামান্য আশ্রয়
একটি ঘাসের দাঁড়িয়ে থাকার মাটি
আজ আমাদের অতীত ইতিহাসের স্বপ্ন, ঠাকুরমার মুখের রূপকথা।
মিছেই মানুষ বেতারে টেলিভিশনে সাংবাদিকের গোল টিবিল বৈঠকে
পরস্পরকে নিন্দা করার উজ্জ্বলতায় নিজের মুখে দেখতে চায় আলো
মিছেই মানুষ নিজের দেশের নিজের দলের গর্ব করে।
আসলে তার পায়ের নীচে কোথাও আর মাটির কোনো চিহ্ন নেই
ছ-ফুট জমি মেপে নিয়ে যেখানে উপনিবেশ গড়া যায়।

চলো আমরা চাঁদের দেশে যাই
সময় থাকলে সোনার চেয়ে মূল্যবান চাঁদকে দিই জাতীয় সংগীত।
অতঃপর চাঁদ ফুরোলে, ঠাকুমার শোলোক শেষ হলে
আবার আমরা নতুন অঙ্ক কষব, শনি বৃহস্পতি মঙ্গালের ভূমি
অগস্ত্যের মতো আমরা শুষে নেব, শান্তিকামী মানুষ;
বেঁচে থাকতে ছ-ফুট জমি চাই।

স্বপ্নে-দেখা ঘরদুয়ার

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পুকুর, মরাই, সবজি-বাগান, জংলা ডুরে শাড়ি,
তার মানেই তো বাড়ি।
তার মানেই তো প্রাণের মধ্যে প্রাণ,
নিকিয়ে—নেওয়া উঠোনখানি রোদ্দুরে টান্-টান্।
ধান খুঁটে খায় চারটে চড়ুই, দোলমঞ্চের পাশে
পায়রাগুলো ঘুরে বেড়ায় ঘাসে।
বেড়ালটা আরমোড়া ভাঙছে; কুকুরটা কান খাড়া
করে শুনছে, কথা বলছে কারা।
পুবের সূর্য পশ্চিমে দেয় পাড়ি,
দুপুরবেলার ঘুমের থেকে জেগে উঠছে বাড়ি।

লাঠির ডগায় পুঁটলি বাঁধা, অনেকটা পথ ঘুরে
লোকটা যাচ্ছে দূরের থেকে দূরে।
ওর চোখেও কি এমনি একটা বাড়ির স্বপ্ন টানা?
ওর মনেও কি গন্ধ ছড়ায় গোপন হাসনুহানা?
ও বড়ো বউ, ডাকো, ওকে ডাকো,
ওই যে লোকটা পার হয়ে যায় কাঁসাই নদীর সাঁকো।

ছাড়পত্র

সুকান্ত ভট্টাচার্য

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম :
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে।
খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত
উত্তোলিত, উদ্ভাসিত
কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়।
সে ভাষা বোঝে না কেউ,
কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার।
আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা
পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের—
পরিচয়-পত্র পড়ি ভূমিষ্ঠ শিশুর
অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে।
এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস।।

যেখানেই থাকি না কেন

সলিল কৃষ্ণ দেববর্মন

আমরা যেখানেই থাকি না—আমরা এক।
আমাদের যেমন আছে উত্তুঙ্গ পাহাড়
তেমনি আছে জলে ভেজা সমতল
আমাদের পায়ের তলায়
একইভাবে মাটি সরে যায়।
আমাদের চোখে আছে সুদিনের হাসি
আর দুর্দিনের হাত ভরা বিশ্বস্ত অভয়
আছে আজো দিগন্ত-প্রসারী হাওয়া
আর আমাদের জন্য আছে কোনোদিন নির্মেঘ আকাশ
হা-হা করা মাঠের শূন্যতা।
আর আছে সূর্য ওঠা, চাঁদ ওঠা
বা নক্ষত্রের মেলা-বসা রাত।

আমরা টের পাই আমাদের সকলের ভাষা এক নয়
কিন্তু প্রতিটি ভাষারই আছে মাতৃ-স্তন
স্নেহভরা তৃষ্ণার আকুতি।
তাই দুঃখ পেলে আমাদের অবস্থার দৃশ্য হয় এক
কিন্তু সমগ্র সুখের ছবি আমরা কেউ দেখিনি এখনো

যেখানেই থাকি না কেন—সংখ্যায় আমরা ঢের
আমাদের শরীরের ঘাম আর তার লোনা স্বাদ
সভ্যতার ভিতের তলায় চাপা থাকে,
আমাদের রক্তবিন্দু, একই ইতিহাস
সর্বত্র লিখে চলে বিষণ্ণ পাথর ও ধূসর মাটিতে।

একুশ

অনিল সরকার

একুশ মানে
ভোরের মিছিল
একুশ মানে ফাগুন।
একুশ মানে
কৃষ্ণচূড়ায়
জ্বলে রক্ত আগুন।।

একুশ মানে
মাতৃভাষা
যেন মাতৃদুগ্ধ।
একুশ মানে
সকল ভাষায়
ফুল ফোটানোর যুদ্ধ।

একুশ মানে
কোকিল গাহে
শহিদ ভাইয়ের ডাক।
ভুবন জুড়ে
মাতৃভাষায়
উচ্চারিত বাক।।

একুশ মানে
পলাশ শিমুল
কৃষ্ণচূড়ার লাল।
এই তো একুশ
কুহু কুহু
শহিদ স্মৃতির কাল।।

একুশ মানে
রক্ত নদী
ভাষার শহিদান।
একুশ মানে
ঢাকা-শিলচর
বর্ণমালার গান।।

একুশ মানে
দুরন্ত কাল
একুশ স্বাধীনতা।
একুশ দিল
শহিদ মিনার
ঝড়ের উপকথা।।

একুশ মানে
ভালোবাসা
খোঁপায় গুচ্ছ ফুল।
একুশ মানে
সেই মেয়েটি
স্বপ্নে যে দেয় দোল।।

ঝড়ের দোল
পলাশ ফুল
আগুন লেলিহান।
একুশ মানে
বুকের ব্যথায়
কেবল কলতান।।

এবার একুশ
বিশ্বজুড়ে
প্রতিবাদের মুখ।
রণধ্বনি
জয়ধ্বনি
পলাশ শিমুল অশোক।।

প্রফুল্ল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ নামে গ্রাম; সেইখানে প্রফুল্লমুখীর শ্বশুরালয়। প্রফুল্লের দশা যেমন হউক, তাহার শ্বশুর হরবল্লভবাবু খুব বড়োমানুষ লোক। তাঁহার অনেক জমিদারি আছে, দোতলা বৈঠকখানা, ঠাকুরবাড়ি, নাটমন্দির, দপ্তরখানা, খিড়কিতে বাগান, পুকুর প্রাচীরে বেড়া। সে স্থান প্রফুল্লমুখীর পিত্রালয় হইতে ছয় ক্রোশ। ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মাতা ও কন্যা অনশনে বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে সে ধনীর গৃহে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশকালে প্রফুল্লের মার পা উঠে না। প্রফুল্ল কাঙালের মেয়ে বলিয়া যে হরবল্লভবাবু তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন, তাহা নহে। বিবাহের পরে একটা গোল হইয়াছিল। হরবল্লভ কাঙাল দেখিয়াও ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন। মেয়েটি পরমাসুন্দরী, তেমন মেয়ে আর কোথাও পাইলেন না, তাই সেখানে বিবাহ দিয়াছিলেন। এদিকে প্রফুল্লের মা, কন্যা বড়োমানুষের ঘরে পড়িল, এই উৎসাহে সর্বস্ব ব্যয় করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই বিবাহতেই—তাঁর যাহা কিছু ছিল, ভস্ম হইয়া গেল। সেই অবধিই এই অন্নের কাঙাল। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে সে সাধের বিবাহে বিপরীত ফল ফলিল। সর্বস্ব ব্যয় করিয়াও—সর্বস্বই তার কত টাকা?—সর্বস্ব ব্যয় করিয়াও সে বিধবা স্ত্রীলোক সকল দিক কুলান করিতে পারিল না। বরযাত্রদিগের লুচি মণ্ডায়, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায়, উত্তম ফলাহার করাইল, কিন্তু কন্যাযাত্রগণের কেবল চিড়া দই। ইহাতে প্রতিবাসী কন্যাযাত্রেরা অপমান বোধ করিলেন। তাঁহারা খাইলেন না—উঠিয়া গেলেন। ইহাতে প্রফুল্লের মার সঙ্গে তাঁহাদের কোন্দল বাঁধিল; প্রফুল্লের মা বড়ো গালি দিল। প্রতিবাসীরা একটা বড়ো রকম শোধ লইল।

পাকস্পর্শের দিন হরবল্লভ বেহাইনের প্রতিবাসী সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা কেহ গেল না—একজন লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, যে কুলটা, জাতিভ্রষ্ট, তাহার সঙ্গে হরবল্লভবাবুর কুটুম্বতা করিতে হয় করুন,—বড়োমানুষের সব শোভা পায়, কিন্তু আমরা কাঙাল গরিব, জাতই আমাদের সম্বল—আমরা জাতিভ্রষ্টার কন্যার পাকস্পর্শে

জলগ্রহণ করিব না। সমবেত সভামধ্যে এই কথা প্রচার হইল। প্রফুল্লের মা একা বিধবা, মেয়েটি লইয়া ঘরে থাকে—তখন বয়সও যায় নাই—কথা অসম্ভব বোধ হইল না, বিশেষ, হরভল্লভের মনে হইল যে, বিবাহের রাত্রে প্রতিবাসীরা বিবাহ-বাড়িতে খায় নাই। প্রতিবাসীরা মিথ্যা বলিবে কেন? হরবল্লভ বিশ্বাস করিলেন। সভার সকলেই বিশ্বাস করিল। নিমন্ত্রিত সকলেই ভোজন করিল বটে—কিন্তু কেহই নববধূর স্পৃষ্ট ভোজ্য খাইল না। পরদিন হরবল্লভ বধূকে মাত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। সেই অবধি প্রফুল্ল ও তাহার মাতা তাঁহার পরিত্যাজ্য হইল। সেই অবধি আর কখনও তাহাদের সংবাদ লইলেন না; পুত্রকে লইতেও দিলেন না। পুত্রের অন্য বিবাহ দিলেন। প্রফুল্লের মা দুই এক বার কিছু সামগ্রী পাঠাইয়া দিয়াছিল, হরবল্লভ তাহা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাই আজ সে বাড়িতে প্রবেশ করিতে প্রফুল্লের মার পা কাঁপিতেছিল।

কিন্তু যখন আসা হইয়াছে, তখন আর ফেরা যায় না। কন্যা ও মাতা সাহসে ভর করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন কর্তা অন্তঃপুরমধ্যে অপরাহ্ণিক নিদ্রার সুখে অভিভূত। গৃহিণী—অর্থাৎ প্রফুল্লের শাশুড়ি, পা ছড়াইয়া পাকা চুল তুলাইতেছিলেন। এমন সময়ে, সেখানে প্রফুল্ল ও তাহার মা উপস্থিত হইল। প্রফুল্ল মুখে আধ হাত ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। তাহার বয়স এখন আঠারো বৎসর।

গিন্নি ইহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা কে গা?"

প্রফুল্লের মা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কী বলিয়াই বা পরিচয় দিব?"

গিন্নি। কেন—পরিচয় আবার কী বলিয়া দেয়?

প্রফুল্লের মা। আমরা কুটুম্ব।

গিন্নি। কুটুম্ব? কে কুটুম্ব গা?

সেখানে তারার মা বলিয়া একজন চাকরানি কাজ করিতেছিল। সে দুই একবার প্রফুল্লদিগের বাড়ি গিয়াছিল—প্রথম বিবাহের পরেই। সে বলিল, "ওগো, চিনেছি গো! ওগো চিনেছি! কে! বেহান?"

(সেকালে পরিচারিকারা গৃহিণীর সম্বন্ধ ধরিত।)

গিন্নি। বেহান? কোন্ বেহান?

তারার মা। দুর্গাপুরের বেহান গো—তোমার বড়ো ছেলের বড়ো শাশুড়ি।

গিন্নি বুঝিলেন। মুখটা অপ্রসন্ন হইল। বলিলেন, "বসো।"

বেহান বসিল—প্রফুল্ল দাঁড়াইয়া রহিল। গিন্নি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটি কে গা?"

প্রফুল্লের মা বলিল, "তোমার বড়ো বউ।"

গিন্নি বিমর্ষ হইয়া কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "তোমরা কোথায় এসেছিলে?"

প্রফুল্লের মা। তোমার বাড়িতেই এসেছি।

গিন্নি। কেন গা?

প্র. মা। কেন, আমার মেয়েকে কি শ্বশুরবাড়িতে আসিতে নাই?

গিন্নি। আসিতে থাকিবে না কেন? শ্বশুর-শাশুড়ি যখন আনিবে তখন আসিবে। ভালো মানুষের মেয়েছেলে কি গায়ে পড়ে আসে?

প্র.মা। শ্বশুর-শাশুড়ি যদি সাত জন্মে নাম না করে?

গিন্নি। নামই যদি না করে—তবে আসা কেন?

প্র. মা। খাওয়ায় কে? আমি বিধবা অনাথিনি, তোমার বেটার বউকে আমি খাওয়াই কোথা থেকে?

গিন্নি। যদি খাওয়াতেই পারিবে না, তবে পেটে ধরেছিলে কেন?

প্র.মা। তুমি কি খাওয়া পরা হিসাব করিয়া বেটা পেটে ধরেছিলে? তাহলে সেই সঙ্গে বেটার বউয়ের খোরাক পোশাকটা ধরিয়া নিতে পার নাই?

গিন্নি। আ মলো! মাগি বাড়ি বয়ে কোঁদল করতে এসেছে দেখি যে?

প্র. মা। না, কোঁদন করিতে আসি নাই। তোমার বউ একা আসিতে পারে না, তাই রাখিতে সঙ্গে আসিয়াছি। এখন তোমার বউ পৌঁছিয়াছি, আমি চলিলাম।

এই বলিয়া প্রফুল্লের মা বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অভাগির তখনও আহার হয় নাই।

মা গেল, কিন্তু প্রফুল্ল গেল না। যেমন ঘোমটা দেওয়া ছিল, তেমনই ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ি বলিল, "তোমার মা গেল, তুমিও যাও।"

প্রফুল্ল নড়ে না।

গিন্নি। নড়ো না যে?

প্রফুল্ল নড়ে না।

গিন্নি। কী জ্বালা! আমার কি তোমার সঙ্গে একটা লোক দিতে হবে না কি?

এবার প্রফুল্ল মুখের ঘোমটা খুলিল; চাঁদপানা মুখ, চক্ষে দর-দর ধারা বহিতেছে। শাশুড়ি মনে মনে ভাবিলেন, "আহা! এমন চাঁদপানা বউ নিয়ে ঘর করতে পেলেম না।"

মন একটু নরম হল।

প্রফুল্ল অতি অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমি যাইব বলিয়া আসি নাই।"

গিন্নি। তা কী করিব মা—আমার কি অসাধ যে, তোমায় নিয়ে ঘর করি? লোকে পাঁচ কথা বলে—একঘরে করবে বলে, কাজেই তোমায় ত্যাগ করতে হয়েছে।

প্রফুল্ল। মা, একঘরে হবার ভয়ে কে কবে সন্তান ত্যাগ করেছে? আমি কি তোমার সন্তান নই?

শাশুড়ির মন আরও নরম হল। বলিলেন, "কী করব মা, জেতের ভয়।"

প্রফুল্ল পূর্ববৎ অস্ফুটস্বরে বলিল, "হলেম যেন আমি অজাতি—কত শুদ্র তোমার ঘরে দাসীপনা করিতেছে—আমি তোমার ঘরে দাসীপনা করিতে দোষ কী?"

গিন্নি আর যুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তা মেয়েটি লক্ষ্মী, রূপেও বটে, কথায়ও বটে। তা যাই দেখি কর্তার কাছে, তিনি কী বলেন। তুমি এখানে বসো মা, বসো।"

প্রফুল্ল তখন চাপিয়া বসিল।

ভাগীরথীর উৎস—সন্ধানে

জগদীশচন্দ্র বসু

আমাদের বাড়ির নিম্নেই গঙ্গা প্রবাহিত। বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল; বৎসরের এক সময়ে কূল প্লাবন করিয়া জলস্রোত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইত; আবার হেমন্তের শেষে ক্ষীণ কলেবর ধারণ করিত। প্রতিদিন জোয়ার—ভাটায় বারিপ্রবাহের পরিবর্তন লক্ষ করিতাম। নদীকে আমার একটি গতি পরিবর্তনশীল জীবন বলিয়া মনে হইত। সন্ধ্যা হলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম। ছোটো ছোটো তরঙ্গাগুলি তীরভূমিতে আছড়াইয়া পড়িয়া কুলু কুলু গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত; যখন অন্ধাকার গাঢ়তর হইয়া আসিত এবং বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত তখন নদীর সেই কুলু কুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম! কখনও মনে হইত, এই যে অজস্র জলধারা প্রতিদিন চলিয়া যাইতেছে ইহা তো কখনও ফিরে না; তবে এই অনন্ত স্রোত কোথা থেকে হইতে আসিতেছে? ইহার কি শেষ নাই? নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" নদী উত্তর করিত, "মহাদেবের জটা হইতে।" তখন ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইত।

তাহার পর বড়ো হইয়া নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা শুনিয়াছি; কিন্তু যখনই শ্রান্তমনে নদীতীরে বসিয়াছি তখনই সেই চিরাভ্যস্ত কুলু কুলু ধ্বনির মধ্যে সেই পূর্বে কথা শুনিতাম, " মহাদেবের জঠা হইতে।"

একবার এই নদীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতানলে ভস্মীভূত হইতে দেখিলাম। আমার সেই আজন্ম পরিচিত, বাৎসল্যের বাসমন্দির সহসা শুন্যে পরিণত হইল। সেই স্নেহের এক গভীর বিশাল প্রবাহ কোন্ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় দেশে বহিয়া চলিয়া গেল? যে যায়, সে তো আর ফিরে আসে না; তবে কী সে অনন্তকালের জন্য লুপ্ত হয়? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি। যে যায়, সে কোথা যায়? আমার প্রিয়জন আজ কোথায়?

তখন নদীর কলধ্বনির মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "মহাদেবের পদতলে।"

চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, কুলু কুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "আমরা যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া যাই। দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা হইতে আসিয়াছ, নদী?" নদী সেই পুরাতন সুরে উত্তর করিল, "মহাদেবের জঠা হইতে।"

একদিন আমি বলিলাম, "নদী আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমার সখ্য। পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি! বাল্যকাল হইতে এ পর্যন্ত তুমি আমার জীবন বেষ্টন করিয়া আছ, আমার জীবনের এক অংশ হইয়া গিয়াছ; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, জানি না। আমি তোমার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপত্তি—স্থান দেখিয়া আসিব।"

শুনিয়াছিলাম, উত্তর পশ্চিমে যে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ দেখা যায় তথা হইতে জাহ্নবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমি সেই শৃঙ্গ লক্ষ করিয়া বহু গ্রাম, জনপদ ও বিজন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কুর্মাচল নামক পুরাণপ্রথিত দেশে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে সরযূ নদীর উৎপত্তি—স্থান দর্শন করিয়া দানবপুরে আসিলাম। তাহার পর পুনরায় বহুল গিরিগহন লঙ্ঘনপূর্বক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

একদিন অতীব বন্ধুর পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার চতুর্দিকে পর্বতমালা, তাহাদের পার্শ্বদেশে নিবিড় অরণ্যানী; এক অভ্রভেদী শৃঙ্গ তাহার বিরাট দেহদ্বারা পশ্চাতের দৃশ্য অন্তরাল করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার পথপ্রদর্শক বলিল, "এই শৃঙ্গে উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। নিম্নে যে রজতসূত্রের ন্যায় রেখা দেখা যাইতেছে উহাই বহু দেশ অতিক্রম করিয়া তোমাদের দেশে অতি বেগবতী, কুলপ্লাবনী স্রোতস্বতী মূর্তি ধারণ করিয়াছে। সম্মুখস্থ শিখরে আরোহণ করিলেই দেখিতে পাইবে, এই সূক্ষ্ম সূত্রের আরম্ভ কোথায়।"

এই কথা শুনিয়া আমি সমুদয় পথশ্রম বিস্মৃত হইয়া নব উদ্যমে পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম।

আমার পথপ্রদর্শক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "সম্মুখে দেখো, জয় নন্দাদেবী! জয় ত্রিশূল!"

কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পর্বতমালা আমার দৃষ্টি অবরোধ করিয়াছিল। এখন উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিবামাত্র আমার সম্মুখের আবরণ অপসৃত হইল। দেখিলাম, অনন্ত প্রসারিত

নীল নভোমণ্ডল। সেই নিবিড় নীলস্তর ভেদ করিয়া দুই শুভ্র তুষার মূর্তি শূন্যে উত্থিত হইয়াছে একটি গরীয়সী রমণীর ন্যায়। মনে হইল যেন আমার দিকে সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার বিশাল বক্ষে বহু জীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই মূর্তি সেই মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইহার অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মেদিনী বিদারণ পূর্বক শানিত অগ্রভাগ দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। ত্রিভুবন এই মহাস্ত্রে প্রথিত। *

এইরূপে পরস্পরের পার্শ্বে সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকর্তার হস্তের আয়ুধ সাকাররূপে দর্শন করিলাম। এই ত্রিশূল যে স্থিতি ও প্রলয়ের চিহ্নরূপী তাহা পরে বুঝিলাম।

আমার পথপ্রদর্শক বলিল, "সম্মুখে এখনও দীর্ঘ পথ রহিয়াছে। উহা অতীব দুর্গম, দুই দিন চলিলে পর তুষার-নদী দেখিতে পাইবে।"

সেই দুই দিন বহু বন ও গিরিসংকট অতিক্রম করিয়া অবশেষে তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ পর্যন্ত আসিয়াছিল, কল্লোলিনীর মৃদু গীত এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল, সহসা যেন কোনো ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে। কোনো মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখানি নিঃশেষ করিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমদ্রের মূর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দুই দিকে উচ্চ পর্বতশ্রেণি, বহুদূর প্রসারিত সেই পর্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগুদেশ পর্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। শিখর-তুষার নিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে।

তুষার-নদীর উপর দিয়া ঊর্ধ্বে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে। আসিবার সময় পর্বতদেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তরস্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে। সেই প্রস্তরস্তূপ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতি দুরারোহ স্তূপ হইতে স্তূপান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যত ঊর্ধ্বে উঠিতেছি বায়ুস্তর ততই ক্ষীণতর হইতেছে; সেই ক্ষীণ বায়ু দেবধূপের সৌরভে পরিপূর্ণ। ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল,

* কুমায়ুনের উত্তরে দুই তুষার শিখর দেখা যায়। একটির নাম নন্দদেবী, অপরটি ত্রিশূল নামে খ্যাত

শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল; অবশেষে হতচেতন-প্রায় হইয়া নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাম।

সহসা শত শত শঙ্খনাদ একত্রে কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অর্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম — সমগ্র পর্বত ও বনস্থলীতে পূজার আয়োজন হইতেছে। জলপ্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমণ্ডলুমুখ হইতে পতিত হইতেছে; সেই সঙ্গে পারিজাত বৃক্ষসকল স্বত পুষ্পবর্ষণ করিতেছে। দূরে দিক আলোড়ন করিয়া শঙ্খ-ধ্বনির ন্যায় গভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধ্বনি, কী পতনশীল তুষার পর্বতের বজ্রনিনাদ স্থির করিতে পারিলাম না।

কতক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গ আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতি বিরাজ করিতেছে; তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূমরাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি মহাদেবের জটা ? এই জটা পৃথিবীরূপিণী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষারকণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলাগ্র শানিত করিতেছে।

শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানসচক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্র প্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয়রূপে পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।

সম্মুখে আকাশভেদী যে পর্বতশ্রেণি দেখিতেছি, হিমানুরূপ বারিকণা উহাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। প্রবেশ করিয়া মহাবিক্রমে উহাদের দেহ বিদীর্ণ করিতেছে। চ্যুত শিখর বজ্রনিনাদে নিম্নে পতিত হইতেছে।

বারিকণারাই নিম্নে শুভ্র তুষার-শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ভগ্ন শৈল এই তুষার-শয্যায় শায়িত হইল। তখন কণাগুলি একে অন্যকে ডাকিয়া বলিল, "আইস, আমরা ইহার অস্থি দিয়া পৃথিবীর দেহ নূতন করিয়া নির্মাণ করি।"

কোটি কোটি ক্ষুদ্র হস্ত অসংখ্য অণুপ্রমাণ শক্তির মিলনে অনায়াসে সেই পর্বতভার বহিয়া নিম্নে চলিল। কোনো পথ ছিল না; পতিত পর্বতখণ্ডের ঘর্ষণেই পথ কাটিয়া লইল—উপত্যকা রচিত হইল। পর্বতগাত্রে ঘর্ষিত হইতে হইতে উপলস্তূপেও চূর্ণীকৃত

হইল।

আমি যে স্থানে বসিয়া আছি তাহার উভয়ত তুষার-বাহিত প্রস্তরখণ্ড রাশীকৃত রহিয়াছে। ইহার নিম্নেই তুষারকণা তরলাকৃতি ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র সরিতে পরিণত হইয়াছে। এই সরিৎ পর্বতের অস্থিচূর্ণ বহন করিয়া গিরিদেশ অতিবর্তন করিয়া বহুল সমৃদ্ধ নগর ও জনপদের মধ্য দিয়া সাগরোদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছে।

পথে একস্থানে উভয় কূলস্থ দেশ মরুভূমি-প্রায় হইয়াছিল। নদীতট উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ প্লাবিত করিল। পর্বতের অস্থিচূর্ণ সংযোগে মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি বর্ধিত হইল। কঠিন পর্বতের দেহাবশেষ দ্বারা বৃক্ষলতার সজীব শ্যামদেহ নির্মিত হইল।

বারিকণাগণই বৃষ্টিরূপে পৃথিবী ধৌত করিতেছে এবং মৃত ও পরিত্যক্ত দ্রব্য বহন করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে। তথায় মনুষ্যচক্ষুর অগোচরে নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইতেছে।

সমুদ্রে মিলিত বারিকণাকুল সর্বদা বিতাড়িত হইয়া বেলাভূমি মগ্ন করিতেছে।

জলকণা কখনও ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পাতালপুরস্থ অগ্নিকুণ্ডে আহুতি স্বরূপ হইতেছে। সেই মহাযজ্ঞোত্থিত ধূমরাশি পৃথিবী বিদারণ করিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গাররূপে প্রকাশ পাইতেছে। সেই মহাতেজে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে, ঊর্ধ্ব ভূমি অতলে নিমজ্জিত ও সমুদ্রতল উন্নত হইয়া নূতন মহাদেশ নির্মিত হইতেছে।

সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই। সূর্যের তেজে উত্তপ্ত হইয়া ঊর্ধ্বে উড্ডীন হইতেছে। ইহারাই একদিন অশনি ও ঝঞ্ঝাবলে পর্বত-শিখরাভিমুখে ধাবিত হইয়া তথায় বিপুল জটাজালের মধ্যে আশ্রয় লইবে; আবার কালক্রমে বিশ্রামান্তে পর্বতপৃষ্ঠে তুহিনাকারে পতিত হইবে। এই গতির বিরাম নাই, শেষ নাই।

এখনও ভাগীরথী-তীরে বসিয়া তাহার কুলু কুলু ধ্বনি শ্রবণ করি। এখনও তাহাতে পূর্বের ন্যায় কথা শুনিতে পাই। এখন আর বুঝিতে ভুল হয় না।

"নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" ইহার উত্তরে এখন সুস্পষ্ট স্বরে শুনিতে পাই—

"মহাদেবের জটা হইতে।"

ছুটির দেশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তখনকার কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত ঘটেছে এ কথা স্পষ্ট বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই আজকাল বাড়ির ছাদে না আছে মানুষের আনাগোনা, না আছে ভূতপ্রেতের। অত্যন্ত বেশি লেখাপড়ার আবহাওয়ায় টিকতে না পেরে ব্রহ্মদৈত্য দিয়েছে দৌড়। ছাদের কার্নিসে তার আরামে পা রাখবার গুজব উঠে গিয়ে সেখানে এঁঠো আমের আঁটি নিয়ে কাকেদের চলেছে ছেঁড়াছেঁড়ি। এ দিকে মানুষের বসতি আটক পড়েছে নীচের তলায় চারকোনা দেয়ালের প্যাকবাক্সে।

মনে পড়ে বাড়ি-ভিতরের পাঁচিল-ঘেরা ছাদ। মা বসেছেন সন্ধেবেলায় মাদুর পেতে, তাঁর সঙ্গিনীরা চারদিকে ঘিরে বসে গল্প করছে। সেই গল্পে খাঁটি খবরের দরকার ছিল না। দরকার কেবল সময়-কাটানো। তখনকার দিনের সময় ভরতি করবার জন্যে নানা দামের নানা মালমশলার বরাদ্দ ছিল না। দিন ছিল না ঠাসবুনুনি করা, ছিল বড়ো-বড়ো-ফাঁক-ওয়ালা জালের মতো। পুরুষদের মজলিশেই হোক, আর মেয়েদের আসরেই হোক, গল্পগুজব হাসিতামাশা ছিল খুবই হালকা দামের। মায়ের সঙ্গিনীদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন ব্রজ আচার্জির বোন, যাঁকে আচার্জিনী বলে ডাকা হত। তিনি ছিলেন এ বৈঠকে দৈনিক খবর সরবরাহ করবার কাজে। প্রায় আনতেন রাজ্যির বিদকুটে খবর কুড়িয়ে কিংবা বানিয়ে। তাই নিয়ে গ্রহশান্তি-স্বস্ত্যয়নের হিসেব হত খুব ফলাও খরচার। এই সভায় আমি মাঝে মাঝে টাটকা পুথি-পড়া বিদ্যের আমদানি করেছি, শুনিয়েছি সূর্য পৃথিবী থেকে ন-কোটি মাইল দূরে। ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ থেকে স্বয়ং বাল্মীকি-রামায়ণের টুকরো আউড়ে দিয়েছি অনস্বার-বিসর্গ-সুদ্ধ; মা জানতেন না তাঁর ছেলের উচ্চারণ কত খাঁটি, তবু তার বিদ্যের পাল্লা সূর্যের ন-কোটি মাইল রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে তাঁকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এ-সব শ্লোক স্বয়ং নারদমুনি ছাড়া আর কারও মুখে শোনা যেতে পারে, এ কথা কে জানত বলো।

বাড়ি-ভিতরের এই ছাদটা ছিল আগাগোড়া মেয়েদের দখলে। ভাঁড়ারের সঙ্গে ছিল তার বোঝাপড়া। ওখানে রোদ পড়ত পুরোপুরি, জারক নেবুকে দিত জারিয়ে। ওইখানে মেয়েরা বসত পিতলের গামলা-ভরা কলাইবাঁটা নিয়ে। টিপে টিপে টপটপ করে বড়ি দিত চুল শুকোতে শুকোতে; দাসীরা বাসি কাপড় কেচে মেলে দিয়ে যেত রোদ্দুরে। তখন অনেকটা হালকা ছিল ধোবার কাজ। কাঁচা আম ফালি করে কেটে কেটে আমসি শুকোনো হত, ছোটো-বড়ো নানা সাইজের নানা-কাজ-করা কালো পাথরের ছাঁচে আমের রস থাকে থাকে জমিয়ে তোলা হত, রোদ-খাওয়া সরষের তেলে মজে উঠত ইঁচড়ের আচার। কেয়াখয়ের তৈরি হত সাবধানে, তার কথাটা আমার বেশি করে মনে রাখবার মানে আছে। যখন ইস্কুলের পণ্ডিতমশায় আমাকে জানিয়ে দিলেন আমাদের বাড়ির কেয়াখয়েরের নাম তাঁর শোনা আছে, অর্থ বুঝতে শক্ত ঠেকল না। যা তাঁর শোনা আছে সেটা তাঁর জানা চাই। তাই বাড়ির সুনাম বজায় রাখবার জন্য মাঝে-মাঝে লুকিয়ে ছাদে উঠে দুটো-একটা কেয়াখয়ের—কী বলব—চুরি করতুম বলার চেয়ে বলা ভালো অপহরণ করতুম। কেন-না রাজা-মহারাজারাও দরকার হলে, এমনকি না হলেও অপহরণ করে থাকেন, আর যারা চুরি করে তাদের জেলে পাঠান, শূলে চড়ান। শীতের কাঁচা রৌদ্রে ছাদে বসে গল্প করতে করতে কাক তাড়াবার আর সময় কাটাবার একটা দায় ছিল মেয়েদের। বাড়িতে আমি ছিলুম একমাত্র দেওর, বউদিদির আমসত্ত্ব-পাহারা, তা ছাড়া আরও পাঁচরকম খুচরো কাজের সাথি। পড়ে শোনাতুম 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'। কখনও-কখনও আমার উপরে ভার পড়ত জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটবার। খুব সরু করে সুপুরি কাটতে পারতুম। আমার অন্য কোনো গুণ যে ছিল, সে কথা কিছুতেই বউঠাকরুন মানতেন না, এমনকি, চেহারারও খুঁত ধরে বিধাতার উপর রাগ ধরিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার সুপুরি-কাটা হাতের গুণ বাড়িয়ে বলতে মুখে বাধত না। তাতে সুপুরি কাটার কাজটা চলত খুব দৌড়বেগে। উসকিয়ে দেবার লোক না থাকাতে সরু করে সুপুরি কাটার হাত অনেক দিন থেকে অন্য সরু কাজে লাগিয়েছি।

ছাদে-মেলে-দেওয়া এই-সব মেয়েলি কাজে পাড়াগাঁয়ের একটা স্বাদ ছিল। এই কাজগুলো সেই সময়কার যখন বাড়িতে ছিল ঢেঁকিশাল, তখন হত নাড়ু কোটা, যখন দাসীরা সন্ধেবেলায় বসে উরুতের উপর সলতে পাকাত, আর প্রতিবেশীর ঘরে ডাক পড়ত আটকৌড়ির নেমন্তন্নে। রূপকথা আজকাল ছেলেরা মেয়েদের মুখ থেকে শুনতে পায় না, নিজে নিজে পড়ে ছাপানো বই থেকে। আচার চাটনি এখন কিনে আনতে হয় নতুনবাজার থেকে—বোতলে ভরা গালা দিয়ে ছিপিতে বন্ধ।

পাড়াগাঁয়ের আরও একটা ছাপ ছিল চণ্ডীমণ্ডপে। ওইখানে গুরুমশায়ের পাঠশালা বসত। কেবল বাড়ির নয়, পাড়াপ্রতিবেশীর ছেলেদেরও ওইখানেই বিদ্যের প্রথম আঁচড় পড়ত তালপাতায়। আমিও নিশ্চয় ওইখানেই স্বরে-অ-স্বরে আ-র উপর দাগা বুলোতে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু সৌরলোকের সব চেয়ে দূরের গ্রহের মতো সেই শিশুকে মনে-আনা-ওয়ালা কোনো দূরবিন দিয়েও তাকে দেখবার জো নেই।

তারপরে বই পড়ার কথা প্রথম যা মনে পড়ে সে ষণ্ডামার্গ মুনির পাঠশালার বিষম ব্যাপার নিয়ে, আর হিরণ্যকশিপুর পেট চিরছে নৃসিংহ-অবতার— বোধ করি সিসের ফলকে খোদাই করা তার একখানা ছবিও দেখেছি সেই বইয়ে! আর মনে পড়ছে কিছু কিছু চাণক্যের শ্লোক।

আমার জীবনে বাইরের খোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ। ছোটো থেকে বড়ো বয়স পর্যন্ত আমার নানা রকমের দিন ওই ছাদে নানাভাবে বয়ে চলেছে। আমার পিতা যখন বাড়ি থাকতেন তাঁর জায়গা ছিল তেতলার ঘরে। চিলেকোঠার আড়ালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে কতদিন দেখেছি, তখনও সূর্য ওঠেনি, তিনি সাদা পাথরের মূর্তির মতো ছাদে চুপ করে বসে আছেন, কোলে দুটি হাত জোড়-করা। মাঝে মাঝে তিনি অনেক দিনের জন্য চলে যেতেন পাহাড়ে পর্বতে, তখন ওই ছাদে যাওয়া ছিল আমার সাতসমুদ্দুর-পারে যাওয়ার আনন্দ। চিরদিনের নীচেতলায় বারান্দায় বসে বসে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে দেখে এসেছি রাস্তার লোক চলাচল; কিন্তু ওই ছাদের উপর যাওয়া লোকবসতির পিলপেগাড়ি পেরিয়ে যাওয়া। ওখানে গেলে কলকাতার মাথার উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে মন চলে যায় যেখানে আকাশের শেষ নীল মিশে গেছে পৃথিবীর শেষ সবুজে। নানা বাড়ির নানা গড়নের উঁচুনীচু ছাদ চোখে ঠেকে, মধ্যে মধ্যে দেখা যায় গাছের ঝাঁকড়া মাথা। আমি লুকিয়ে ছাদে উঠতুম প্রায়ই দুপুরবেলায়। বরাবর এই দুপুরবেলাটা নিয়েছে আমার মন ভুলিয়ে। ও যেন দিনেরবেলাকার রাত্তির, বালক সন্ন্যাসীর বিবাগি হয়ে যাবার সময়। খড়খড়ির ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে ঘরের ছিটকিনি দিতুম খুলে। দরজার ঠিক সামনেই ছিল একটা সোফা; সেইখানে অত্যন্ত একলা হয়ে বসতুম। আমাকে পাকড়াও করবার চৌকিদার যারা, পেট ভরে খেয়ে তাদের ঝিমুনি এসেছে, গা মোড়া দিতে দিতে শুয়ে পড়েছে মাদুর জুড়ে। রাঙা হয়ে আসত রোদ্দুর, চিল ডেকে যেত আকাশে। সামনের গলি দিয়ে হেঁকে যেত চুড়িওয়ালা। সেদিনকার দুপুরবেলাকার সেই চুপচাপ বেলা আজ আর নেই, আর নেই সেই চুপচাপ বেলার ফেরিওয়ালা।

হাম্বির

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিতোর তখনও পাঠানের হস্তগত হয়নি। মেবারে তখনও ভীমরানার অটুট প্রতাপ। মহারানার লক্ষ্মণসিংহের সুশাসনে দেশ যখন শান্তিতে সুখে ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ, সেই সময় একদিন যুবরাজ অরিসিং দলবল নিয়ে শিকারে গিয়েছিলেন। অন্ধোয়া বনের ধারে উজলা গ্রামে মেঠো রাস্তায় শিকারির দল রাজকুমারের সঙ্গে সঙ্গে শিকারের পিছনে ছুটে চলেছিল—শিকার একটা ছুঁচালো-মুখ দাঁতালো বরাহ। বেলা দুপুরে মেঠো রাস্তায় অনেকখানি ধুলো উড়িয়ে অনেকদূর ছুটে গিয়ে রাজকুমারের শিকার রাস্তার একধারে জনার খেতের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ল—সেখানে ঘোড়া চলে না, তির তো ছুটেই না।

খেতের মাঝে মাচার উপর দাঁড়িয়ে এক রাজপুতের মেয়ে এই তামাসা দেখছিল—পরনে তার পিলা ওরনি, নীল আঙ্গিয়া। রাজকুমারের গায়ে ছিল সবুজ দোপাট্টা। দুজনের চোখ দুজনের উপর পড়েছিল। শিকারের আশায় হতাশ হয়ে অরিসিংহ যখন বুনাস নদীর তীরে আমবাগানে ফিরে চলেছিলেন, খেতের ভিতর থেকে রাজপুতের মেয়ে সেই সময় বরাহটা মেরে শিকারিদের ভেট দিয়ে গেল।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, "ক্যায়সে মারা?"

বালিকা বল্লমের মতো সিধে একটা জনারের শিষ দেখিয়ে বললে—"ইসিসে ঘায়েল কিয়া।" তার ধুলোমাখা কালো চুলগুলি সাপের ফণার মতো সুন্দর মুখের চারিদিকে বড়ো শোভা ধরেছিল। তার সুডৌল হাতে পিতলের কাঁকন সূর্যের আলোয় সোনার মতো কেমন ঝকঝক করছিল। বুনাস নদীর তীরে আমবাগানের শীতল ছায়ায় সেই কথাই ভাবতে ভাবতে রাজকুমারের তন্দ্রা আসছিল।

সবুজ খেতের মাঝে মাটির ঢেলা ফেলে পাখি আর ছাগল তাড়াতে—তাড়াতে মেয়েটিও রাজকুমারের কথা ভাবছিল কি না কে জানে; কিন্তু এক সময় তার হাত

থেকে ঠিকরে একটা মাটির ঢেলা সেই আমবাগানের ধারে ঘোড়ার পায়ে এসে লাগল। হঠাৎ ঘোড়ার তড়বড় শব্দে চমকে উঠে রাজকুমার চেয়ে দেখলেন আমবাগানের ফাঁকে একটুখানি সবুজ খেত—তারই মাঝে সেই নীল-আঙ্গিয়া, পীলা-ওড়নি কৃষক নন্দিনী।

পশ্চিম বাতাসে অড়রের খেতে ঢেউ উঠেছে, এক দল টিয়া পাখি ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলেছে, বেলা-শেষে দিনের আলো নিবু—নিবু, পাথরের মতো পবিষ্কার আকাশ,তার কোলে কালো মেঘের সরু রেখা—রাজকুমার শিকার শেষে বাড়ি চলেছেন। নদীর ধারে যেখানে গ্রামের পথ আর মাঠের রাস্তা এক হয়েছে সেইখানে দুজনে আবার দেখা হল—বালিকা মাথায় দুধের কলশি নিয়ে মাঠ ভেঙে গ্রামে চলেছে—সঙ্গে দুটি চিকন কালো ছানা ভৈঁষ।

পরদিন উজলা গ্রামের সেই বালিকার ঘরে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে রাজকুমারের দূত এল! বালিকার পিতা চন্দাসো বংশের চৌহান রাজপুত কিছুতেই গেহলোট বংশে কন্যাদানে সম্মত নয়—রাজকুমার হতাশ হয়ে রাজ্যে ফিরলেন। এদিকে সেই বৃদ্ধ রাজপুতের ঘরে গৃহিণীর কাছে পাড়াপরশির দুয়ারে লাঞ্ছনা—গঞ্জনার সীমা—পরিসীমা রইল না। এমন কাজও করে? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে আছে? যেমন বুদ্ধি, তেমনি চিরটা কাল চাষা হয়েই থাক।

বুড়ো কিন্তু সকলের কথায় একই জবাব দিত, "তোমরা যাই বলো, আমি কিন্তু লছমিকে কখনোই রাজবাড়িতে পাঁচ সতিনের দাসী করে দিতে পারিনে; তার চেয়ে আমার মেয়ে গরিবের ঘরে গিন্নি হয়ে থাকে সে ভালো।"

কিন্তু বুড়োর প্রতিজ্ঞা বেশি দিন রইল না। চিতোর থেকে দূত এল, পদ্মিনী রানি লিখেছেন : "আমি নিঃসন্তান, তোমার কন্যাকে ভিক্ষা চাই; আমার আশীর্বাদে চিতোরের রাজলক্ষ্মী তোমার বংশকে বরণ করুন।"

সতীর কথা ব্যর্থ হয় না। লছমির সন্তান যে চিতোরের সিংহাসনে বসবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। ধুমে-ধামে আলো জ্বালিয়ে, ঘোড়া সাজিয়ে বর-বেশে যুবরাজ এলেন যেন কোনো স্বপ্নের রাজ্য থেকে। রাজপুত্র এসে উজলাগ্রামে উদয় হলেন—আনন্দে, আলোয়, নাচে-গানে সমস্ত গ্রাম এক রাতের মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সুখের বাসর আনন্দের মধ্যে কখন কাটল বোঝা গেল না।

এক বৎসর পরে যুবরাজ লছমিরানিকে আর এক মাসের শিশু রাজপুত্র হাম্বিরকে উজলাগ্রামে রেখে পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে গেলেন। সে যুদ্ধে যে গেল তাকে আর ফিরতে হল না। রানা গেলেন, রাজপুত্রেরা গেলেন, ভীমসিংহ গেলেন, রানি পদ্মিনী, রাজবধূ, রাজমাতা, সকলে গেলেন। চিতোর-লক্ষ্মী অন্তর্ধান করলেন। রইলেন কেবল উজলাগ্রামের হাম্বিরকে নিয়ে রানি লছমি, আর কৈলোরের কেল্লায় মেবারের রানার বংশধর অজয়সিংহ।

একদিকে শোরোনাল বলে একখানি ছোটো গ্রাম, আরদিকে আরাবল্লি পর্বত, মাঝে একটি ছোটো পাহাড়ের উপর কৈলোরের পুরাতন কেল্লা। এক সময়ে পাহাড়ি ভিলদের শাসনে রাখার জন্যে ওই কেল্লা প্রস্তুত হয়েছিল। তখন চিতোরের মহারানা বছরের মধ্যে প্রায় চার মাস এখানেই কাটাতেন। তখন কেল্লার শ্রী-ই ছিল এক! তারপর পাহাড়ি জাত যখন ক্রমে ক্রমে অধীন হয়ে শত্রুতা ছেড়ে বশ্যতা মানলে তখন আর বড়ো একটা আসার প্রয়োজন হত না। কচিৎ দুই একজন রাজকুমার শিকারে এসে রাত্রিবাস করে যেতেন। কেল্লাও ক্রমে ভেঙে-চুরে বন-জঙ্গল আর কাঁটাগাছে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুতের মাঝে চিতোরের রানা লক্ষ্মণসিংহের বংশধর রাজ্যহারা অজয়সিংহ স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে একদিন এই কেল্লায় আশ্রয় নিলেন। সে দুঃখের রাত কী দুঃখে কেটেছিল কে বলবে! মাথার উপর দিয়ে ফাটা ছাদ দিয়ে বৃষ্টির ধারা পড়ছে, ঘরের কোণে ইন্দুরের খুটখাট, বাদুড়ের ঝটাপট—রাজার ছেলে রাজার রাজার বউ তারই মাঝে ভিজে ঘরে খড়ের বিছানায় ঘোড়ার কম্বল ঢাকা দিয়ে রাত কাটালেন। সকালে গ্রামবাসীরা রাজা দেখতে এসে দেখলে তাদের রাজার বসবার সিংহাসন, শোবার খাটিয়া নেই; রাজার রানি, রাজার ছেলে ঘোড়ার কম্বলে বসে আছেন। মেবারের রানা অজয়সিংহ আজ কোথায় সোনার সিংহাসনে রাজছত্র মাথায় দিয়ে বসবেন, রানিমা কোথায় দুই রাজকুমার অজিমসিংহ সুজনসিংহকে নিয়ে গজদন্তের পালঙ্কে আরাম করবেন, না তাঁদের এ দুর্দশা? গ্রামবাসীরা তখনই যত্ন করে কেল্লা পরিষ্কার করতে লাগল, ঘর সাজাতে লাগল, গ্রামের জোতদার গজদন্তের খাট-সিংহাসন, কিংখাবের শুজনি, জরির চাঁদোয়া, শ্বেত চামর, চন্দনের পাখা, রুপোর প্রদীপ, সোনোর বাটা, শ্বেত পাথরের বাসন হাজির করলে। খেত থেকে চাষির মেয়েরা তরি-তরকারি, ঘিয়ের মট্‌কি, দুধ দেবার গাই, ঘোড়ার ঘাস

নিয়ে হাজির হল। দেখতে-দেখতে সাজসরঞ্জামে কেল্লার শ্রী ফিরে গেল। সন্ধ্যার সময় গ্রামবাসিরা তাদের রাজার মুখে, রানির মুখে দুই রাজপুত্রের মুখে হাসি দেখে বিদায় হল।

ভক্ত প্রজার প্রাণপণ সেবায় অজয়সিংহ সব দুঃখ ভুললেন, কেবল চিতোর যে এখনও পাঠানের হস্তগত এ দুঃখ তাঁর মন থেকে কিছুতে গেল না। তিনি প্রায়ই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতেন, "হায়! সূর্য এখনও রাহুগ্রস্ত, কবে এ গ্রহণ শেষ হবে তা কে জানে! সেই সুদিনের প্রতীক্ষা করে আমায় কতকাল থাকতে হবে কে বলতে পারে।"

দিন যেতে লাগল। কিন্তু যে সুদিনের প্রতীক্ষায় অজয়সিংহ রইলেন, সে সুদিন বুঝিবা আর এল না। পাঠানের হাত থেকে চিতোর উদ্ধার করতে অজয়সিংহ প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু তাঁর লোকবল অর্থবল কোথায়? বড়ো আশা ছিল দুই রাজকুমার অজিমসিংহ, সুজনসিংহ বড়ো হয়ে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করবে।—কিন্তু হায়, বিধাতা সে সাধেও বাদ সাধলেন।

সেদিন বর্ষাকাল, মেঘের ঘটা আরাবল্লি পর্বতের শিখরে—শিখরে কাজলের মতো ছায়া ফেলেছে। গ্রামের উপর খেতের উপর দিয়ে আলো— আঁধারের খেলা চলেছে। দুই রাজকুমার শিকারে বেরিয়েছেন, রাজা—রানিতে মহলের ভিতর একলা আছেন।

সন্ধ্যা হল—রাজকুমারেরা ঘরে ফিরছেন না, রানিমা এক-একবার খোলা জানলায় চেয়ে দেখছেন। দেখতে—দেখতে পশ্চিম মেঘের তীরে একটুখানি সোনার ঢেউ খেলিয়ে সূর্যদেব অস্ত গেলেন। রাত্রির অন্ধকার মেঘের অন্ধকারে গাঢ়তর হয়ে এল। রানিমা রাজার সঙ্গে কথা বলছেন আর বারে—বারে জানলার পানে চেয়ে দেখতেন।

রাজা বললেন, "তোমায় আজ আনমনা দেখছি যে?"

"কে জানে প্রাণটা কেমন করছে," বলে রানিমা উঠে গেলেন। দাসী ঘরে এসে প্রদীপ দিয়ে গেল। টুপটাপ করে ক্রমে বড়ো—বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি নামল।

রানিমা মলিন মুখে ফিরে এসে বললেন, "এরা যে দুভায়ে সকাল থেকে শিকারে গেল, এখনও এল না কেন?"

রানা বলে উঠলেন, "সে কী? এখনও এরা ফেরেনি? এই ঝড়-বৃষ্টিতে দুজনে কোথায় রইল?" বলতে-বলতে কেল্লায় উঠানে লোকের কোলহল শোনা গেল। তখন মেঘ কেটে গিয়ে চন্দ্রোদয় হচ্ছে; রাজা রানি দেখলেন জনকয়েক গ্রামবাসী কাকে যেন ধরাধরি করে নিয়ে আসছে। একজন দাসী এসে তাড়াতাড়ি এসে খবর দিয়ে গেল, "রানিমা, দেখুন গিয়ে বড়োকুমার অজিম বাহাদুরের কী হয়েছে," বলতে-বলতে লোকজনে ধরাধরি করে রাজকুমারকে নিয়ে উপস্থিত হল। রাজা রানি শুনলেন, পাহাড়ের উপর শিকার করতে গিয়ে মুঞ্জ বলে যে ভিল সর্দার, তার ছেলের সঙ্গে সুজন বাহাদুরের হরিণ নিয়ে ঝগড়া হয়, ক্রমেই লড়াই বাধে। বড়োকুমার তাকে রক্ষা করতে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছেন। রানা জিজ্ঞাস করলেন, "আর সুজন সিং কোথায় গেলেন?"

লোকজনেরা মাথা চুলকে বললে, "আজ্ঞে তিনি ভালো আছেন, আমাদের তিনি পাঠিয়ে দিলেন। নিজে একটা চটিতে বিশ্রাম করছেন, এলেন বলে!" পথের ধারে চটিতে বিশ্রাম করা মানে পাঁচ ইয়ারে মিলে সিদ্ধি টেনে আড্ডা দেওয়া। রানা বুঝলেন; বুঝেই বললেন, "বিপদের সময় বিশ্রাম না করলেই নয়!"

লোকজন সকলে বিদায় হল। রাজা রানি রাজবৈদ্য আর দু-একজন দাসী অচৈতন্য অজিমকে ঘিরে রইলেন। সমস্ত রাত্রে রাজকুমারের চেতনা হল না। রাজবৈদ্য ঘাড় নেড়ে বললেন, "আঘাত সাংঘাতিক।" ভোরে আলোর সঙ্গে-সঙ্গে রাজকুমার একবার চোখ চাইলেন; একবার "মা" বলে ডাকলেন; তারপর খাঁচা ছেড়ে পাখি যেমন উড়ে যায় তেমনি রাজকুমারের সেই সোনার দেহ ছেড়ে প্রাণ-পাখি চলে গেল। তারপর দিনের পর দিন কাটতে লাগল। অজয়সিংহ শোকে-দুঃখে নিরাশায় দিন-দিন ম্রিয়মান হতে লাগলেন। আর সেই দুর্দান্ত মুঞ্জ ডাকাত দিন-দিন প্রবল হয়ে গ্রামবাসীদের উপর প্রজালোকের ঘরে বিষময় উৎপাত আরম্ভ করলে। এমনকি দুরন্ত ডাকাত এসে একদিন কৈলোরের কেল্লা পর্যন্ত লুঠ করে গেল। ডাকাত অজয়সিংহের মুকুট কেড়ে নিয়ে তাঁর মাথায় তলোয়ারের চোট মেরে চলে গেল। বৃদ্ধ অজয়সিংহ, নেশাখোর সুজন বাহাদুর—প্রজালোককে কে রক্ষা করে? একদিকে পাঠানের উৎপাত আর একদিকে মুঞ্জু ডাকাতের নিষ্ঠুর অত্যাচার। ওদিকে আবার চারদিকে খবর হল—রানা আর বেশিদিন বাঁচেন কিনা সন্দেহ। রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল সকলেই বলতে লাগল এতদিন বুঝি সূর্যবংশের গৌরব শেষ হয়। সুজন

বাহাদুর যে রাজ্য চালাতে পারেন, এমন তো বোধ হয় না।

রাজ্যের যখন এ দুরবস্থা সেই সময় উজলাগ্রাম থেকে লছমিরানি হাম্বিরকে নিয়ে কৈলোরে উপস্থিত হলেন। রানার আত্মীয়স্বজন দেশের সর্দার সামন্ত যে যেখানে ছিলেন উপস্থিত। রানা সকালে সভা করে বসেছেন, এদের প্রণাম করলেন। রানা আশীর্বাদ করে হাম্বিরকে কাছে বসালেন! হাম্বিরকে দেখে আজ তাঁর দাদা অরিসিংহকে মনে হল। সেই নাক সেই চোখ।; দাদার মতো তেমনি সুন্দর বলিষ্ঠ শরীর, গলার স্বর তেমনি মধুর গম্ভীর। আজ অজয়সিংহের মনে পড়ল তাঁর দাদা অরিসিংহ পাঠানের সঙ্গে শেষ যুদ্ধে যাবার আগে তাঁর হাতে একখানি চামড়ার থলি আর একখানি চিঠি দিয়ে বলেছিলেন, "এই চিঠিতে আমার শেষ ইচ্ছা রইল। আর এই থলিতে একখানি ছোরা রইল, হাম্বির বড়ো হলে এ দুটি তাকে দিও।"

রানা অজয় আজ তাঁর সামন্ত-সর্দারের সম্মুখে অরিসিংহের নিজের হাতের ছোরা আর মোহর-করা সেই চিঠি হাম্বিরের হাত দিয়ে বললেন, "বৎস, পড়ে দেখো, তোমার পিতার শেষ ইচ্ছা কী।" পত্রে লেখা ছিল—

শ্রীরাম জয়তি

শ্রীগনেশ প্রসাদ　　শ্রীকলিঙ্ক প্রসাদ

মহারাজ অধিরাজ শ্রীঅরিসিংহ আদেশত :—

অতঃপর অজয়সিংহজি ও মেবারের দশ সহস্র অধিকারের সামন্ত-সর্দার ও জনপদবর্গকে আমার আদেশ এই যে—ভবানী মাতার ইচ্ছায় পাঠান যুদ্ধ সংকট সমরে যদি আমার স্বর্গলাভ ঘটে, তবে দেশাচার মতো ভাইজি অজয়সিংহ একলিঙ্গজির দেওয়ানি গ্রহণ করিয়া যথাবিহিত প্রজাপালন ও রাজ্যচালনা করিতে থাকিবেন ও আমার বিধবা পত্নী রানি লছমিও শিশুপুত্র হাম্বিরকে লইয়া যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে উজলাগ্রামে বাস করিতে পারেন সেজন্য উজলাগ্রাম ও তাহার সংলগ্ন সমুদয় জমি-জমা রানির নিজ নামে বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। আমি নিজ বুদ্ধি ও বিশ্বাস মতো দেওয়ানির বন্দোবস্ত করিয়া গেলাম, কিন্তু ইতঃপর সিংহাসন লইয়া হাম্বির ও ভাইজির সন্তানগণের মধ্যে বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা, সে নিমিত্ত শেষ অনুরোধ এই যে, আমাদের সামন্ত-সর্দার-মন্ত্রীবর্গ এবং প্রজালোক যাহাকে উপযুক্ত বিবেচনায় দেওয়ানিতে বহাল করিবেন তিনিই রাজ্যধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন। হাম্বির ও অন্যান্য কুমারের প্রতি আমার এই আদেশ যে তাঁহারা এই উত্তরাধিকার-সূত্র

লইয়া বিবাদ না করেন। দেশের সংকট অবস্থা—এ সময়ে গৃহ-বিবাদ বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের মধ্যে যে কুসন্তান এই গৃহ-বিবাদে লিপ্ত হইবে, ভগবান একলিঙ্গের অভিশাপ যেন তাহাকে স্পর্শ করে। ইতি সম্বৎ ১৩৩৩ চিতৈরগড়।

পত্রপাঠ শেষ হলে রানা সকলের দিকে চেয়ে বললেন, "এখন কী করা কর্তব্য। রাজ্যের সমস্ত সামন্ত-সর্দারই উপস্থিত আছেন; আমার ইচ্ছা, এই সভাতেই সিংহাসন সুজন বাহাদুরের কি হাম্বিরের এ বিষয়ে একটা মীমাংসা হোক। আমি বুঝেছি, আমি আর অধিক দিন নয়; অতএব আমি বেঁচে থাকতেই উপযুক্ত কোনো এক কুমারের হাতে দেওয়ানির ভার দিতে চাই। এখন দুই কুমারের মধ্যে কে উপযুক্ত তোমরা সকলে স্থির করো।"

রাজসভায় তুমুল তর্ক উঠল। সেই সময় পেট-মোটা, নেশায় ঢুলু-ঢুলু রক্তচক্ষু সুজনসিংহ সভায় প্রবেশ করলেন। সভায় দুই দল হল। একদল বললে, সুজন বাহাদুরেরই সিংহাসন পাওয়া উচিত, কেন-না রাজ্য চালাতে বাহুবলের প্রয়োজন, এবং বাহুবলটা যে সুজন বাহাদুরের যথেষ্ট আছে সেটা সকলেই জানে। অন্য দল বলে উঠল, শুধু কি বাহুবলের কর্ম। রাজ্য চালাতে গেলে ধৈর্য চাই, বুদ্ধি চাই, সুজন বাহাদুরের এ দুটোর একটাও নেই। সৈন্যই রাজার বল, রাজাকে যদি নিজেই লড়াই করতে হলে তবে আমরা আছি কী করতে? আমরা তো বলি হাম্বিরকেই রাজা করা উচিত। অন্য দল বলে উঠল, বাপু হে, যে দিন কাল পড়েছে, তাতে মুকুট মাথায় দিয়ে সিংহাসনে বসে থাকলে আর চলছে না; এখন রীতিমতো লড়াই করতে হবে। আমরা এমন রাজা চাই, যে একাই একশো পাঠান ঠেকাতে পারে। দুই দলে প্রচণ্ড তর্ক, শেষে হাতাহাতি হবার জোগাড়।

অজয়সিংহ বললেন, "তোমরা স্থির হও, আমি যা বলি, শোনো। তোমরা তো জান ভিল-সর্দার মুঞ্জ সেদিন কেল্লালুঠ করে গেছে, আমাদের সাধ্য হয়নি যে তাদের বাধা দিই! সেই রাত্রে ডাকাত এই কেল্লা থেকে চিতোরের রাজমুকুট নিয়ে পলায়ন করেছে। শুধু তাই নয়, আমি সংবাদ পেয়েছি সে নাকি আবার সে রাজমুকুট মাথায় দিয়ে নিজেকে রাজস্থানের রাজা বলে প্রচার করেছে। সূর্যবংশের এই ঘোর অপমানের একমাত্র প্রতিকার, সেই রাজমুকুট উদ্ধার করা। হাম্বির আর সুজন দুইজনই এখন উপযুক্ত। দুইজনের মধ্যে যিনি সেই পাপাত্মার মুণ্ডসমেত মুকুট উদ্ধার করতে পারেন তিনি রাজ্যের অধিকারী হউন। কৃতঘ্ন ভিল যে মাথায়

মেবারের রাজমুকুট ধারণ করতে সাহসী হয়েছে, সে মাথা শীঘ্র আমি চাই, নচেৎ আমার জীবনে মরণেও শান্তি নেই। মেবারের দুই উপযুক্ত রাজকুমার বর্তমান থাকতে যদি সে মুকুট উদ্ধার না হয়, তবে জানলেম মেবারের সূর্যবংশ আজ নির্বংশ হয়েছে; রাজ্যে বীর নেই, রাজসিংহাসন ভিল আর পাঠানের পাওয়াই শ্রেয়। কেল্লার যত সৈন্য যত অস্ত্র আছে, দুই কুমার ইচ্ছা মতো ব্যবহার করুন। আজ সভা ভঙ্গ করো।" কোলহলে রাজসভা ভঙ্গ হল।

তার পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে নিজের বন্ধু-বান্ধব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সুজন বাহাদুর ডাকাত ধরতে চললেন। আজ তিনি ভারী ব্যস্ত। অন্যদিন বেলা এগারোটার পূর্বে সুজন বাহাদুরের ঘুম ভাঙত না, আজ তিনি ভোর না হতেই প্রস্তুত। এত ব্যস্ত যে হাম্বিরকে সঙ্গে ডেকে নিয়ে যান তারও সময় হল না। কেল্লার জনপ্রাণী না উঠতে-উঠতে বড়োকুমার সুজন সিংহ, দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দু-একজন সামন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "কই, ছোটো রাজকুমার গেলেন না?"

সুজনসিংহ হেসে বললেন, "তিনি একটু আরাম করছেন। চল আমরা আগে যাই, তিনি আহারাদি করে পরে আসবেন এখন।"

অমনি একজন খোশামুদে রাজপারিষদ বলে উঠল, "চলুন আমরা আগে তো গিয়ে ডাকাতের বাসা ঘেরাও করি, পরে না হয় ছোটোকুমার এসে তার মুণ্ডুটা কেটে নিয়ে যাবেন।" অন্যজন বা বললে, "হুঁ, রানার বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে। একি যার তার কর্ম? বুকের পাটা চাই। ডাকাত বলে ডাকাত—মুঞ্জ ডাকাত! নামে যার দেশসুদ্ধ থরহরি কম্প, তাকে ধরতে কিনা ছোটোকুমার! হাতি মারতে পতঙ্গ!" ওর মধ্যে কোনো এক মন্ত্রীপুত্র বলে উঠল, "না হে না, রাজবুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করা কি তোমাদের কর্ম। কন্টক দিয়ে কন্টক উদ্ধার, বুঝলে কিনা।"

সুজনসিংহ হেসে বললেন, "না হে না, তোমরা জানো না, হাম্বিরের গায়ে বেশ শক্তি আছে। তবে কি জানো, ছেলেমানুষ, এখনও হাড় পাকেনি। আমি এবার লড়াই থেকে এসেই তাকে রীতিমতো কুস্তি শেখবার বন্দোবস্ত করছি, দেখো না।"

এদিকে সকালে উঠে হাম্বির একখানা পুরোনো তালোয়ার আর একখানা ছোরা শান্-পাথরে ঘষে-ঘষে সাফ করছিলেন। ছোরাখানা পিতা অরিসিংহের, আর তালোয়ারখানা উজলাগ্রামের দাদামশায় হাম্বিরকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আজ কতকাল পরে শান্ পেয়ে অস্তর দুখানা বর্ষার জল পেয়ে নদীর স্রোতের মতো

ক্রমে খবধার হয়ে উঠল। হাম্বির বসে-বসে অস্তরে শান্ দিচ্ছেন, এমন সময় লছমিরানি সেখানে এসে বললেন, "এখানে বসে কী করছিস?"

হাম্বির বললেন, "জানো না মা? ডাকাত ধরতে যেতে হবে, তাই অস্তর দুখানায় শান্ দিচ্ছি।"

লছমিরানি বললেন, "হা কপাল! তুমি এখনও অস্তর শান দিচ্ছ, আর ওদিকে যে সুজনসিংহ সৈন্যসামন্ত নিয়ে ডাকাত ধরতে গেল। তোর চেয়ে তো সে কাজের লোক দেখি, লোক কেবল তাঁর মিছে দুর্নাম রটায় বুঝলাম।"

হাম্বির যেন মায়ের কথায় একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তাই তো মা, দাদা তো আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন না? রাজত্বিটা দেখছি আমার কপালে নেই। যাই হোক, আমি ছাড়চিনে।"

এই কথা বলে হাম্বির দ্বিগুণ উৎসাহে তলোয়ার শান্ দিতে লাগলেন। রানিমা বললেন, "যা যা, বেলা হল—এখন কিছু খেয়ে আয়, আমি ততক্ষণ এ দুখানায় শান্ দিচ্ছি।" হাম্বির উঠে গেলেন, লছমিরানি বসে-বসে অস্তরে শান্ দিতে লাগলেন। রাজপুতের মেয়ে বাটনা বাটা কুটনো কোটার চেয়ে অস্তরে শান্ দেওয়া ভালো বোঝেন। তাঁর হাতে পড়ে অস্তর দুখানা কিছুক্ষণের মধ্যেই চকচকে ঝকঝকে হয়ে উঠল। হাম্বির ফিরে এলে রানিমা তার হাতে ছোরাখানা দিয়ে বললেন,"দেখ দেখি এটায় যেন ফাট ধরেছে বোধ হয়। আঁকা-বাঁকা যেন কীসের দাগ দেখছি! এখানায় তো কোনো কাজই হবে না।"

হাম্বির বললেন, "বলো কী মা, বাবার হাতের ছোরা কাজে লাগবে না কি? দাও দেখি একবার ভালো করে দেখি।" হাম্বির ছোরাখানা নিয়ে এদিক-ওদিক ফিরিয়ে দেখলেন, কিছু বোঝা গেল না। মনে হল যেন ছোরার ফলকটার একদিক থেকে আর একদিক জুড়ে একটা আঁকা-বাঁকা ফাট। ফাট কি রক্তের দাগ চেনা যায় না!

হাম্বির বললেন, "তাই তো, এটা তো কিছু বোঝা গেল না; ভালো করে দেখতে হবে! মা তুমি অস্তর দুখানা আমার ঘরে রেখে দিও। আমি একবার মহারাজার সঙ্গে দেখা করে আসি, একটা ভালো ঘোড়া দেখে নিতে হবে।"

অজয়সিংহ আজ সভায় যাননি। শরীর অসুস্থ, নিজের মহলে বিশ্রাম করছিলেন, হাম্বিরকে আসতে দেখ বললেন, "সে কি, তুমি যাওনি? সুজন তো অনেকক্ষণ

রওনা হয়েছে।

হাম্বির বললেন, "আজ্ঞে, একটি ঘোড়া বেছে নিতে কিছু বিলম্ব হবে, আমি আজ সন্ধ্যাকালেই রওনা হব।"

অজয়সিংহ বললেন, "লোকজন তো সব বড়োকুমারের সঙ্গে চলে গেছে, তুমি একা পথ চিনবে কেমন করে?"

হাম্বির বললেন, "আজ্ঞে, একজন শিকারির সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি, সে-ই আমাকে ডাকাতের আড্ডা দেখিয়ে দেবে। আমি মনে করেছিলুম, লোকজন নিয়েই যাব, কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম, মুঞ্জ ভিল যে রকম দুর্দান্ত, তার সঙ্গে লোকজন নিয়ে পেরে ওঠা অসম্ভব। কৌশল কার্য সিদ্ধ করা চাই।"

অজয়সিংহ বললেন, "যা ভালো বোঝো তাই করো। আশীর্বাদ করি জয়ী হও।" হাম্বির প্রণাম করে বিদায় হলেন।

হাম্বির নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিলেন, লছমিরানি এসে বললেন, "কই তোর যাবার কী হল? তোর তো লড়াইয়ে যাবার কোনো চেষ্টাই নেই দেখছি। ভয় পেলি নাকি? এই যে বললি, ঘোড়া ঠিক করতে যাচ্ছি, আর ঘরে এসে ঘুম দিচ্ছিস!"

হাম্বির একটুখানি হেসে বললেন, "রসো মা, ডাকাত ধরতে যাওয়া কী সহজ ব্যাপার? একটু ভেবে নিতে দাও, ফন্দি আঁটতে দাও! একি বুনো শুয়োর, যে যাব আর জনারের শিষে গেঁথে আনব।"

লছমিরানি বুঝলেন, হাম্বির মুখে তামাশা করছেন, কিন্তু মনে-মনে যেন কী একটা মতলব স্থির করে বসে আছেন। তিনি হাম্বিরের দিকে চেয়ে বললেন, "বটে, আমার সঙ্গে তামাশা হচ্ছে? একটা জনারের শিষ দিয়ে বুনো শুয়োর গেঁথে আন্, তবে বাহাদুর বুঝি। দেখা যাবে ওই পুরোনো তলোয়ার আর দাগি ছোরায় কতদূর কী করো! এখন বল্ দেখি তোর মতলব কী?" তারপর মায়েতে ছেলেতে সেই নির্জন ঘরে সারাদিন কত কী পরামর্শ হল। সন্ধ্যা হয়-হয়, রানি লছমি বললেন, "তুই প্রস্তুত হ—আর বিলম্ব করলে রাত্রি হয়ে পড়বে।"

হাম্বির বললেন, "আর প্রস্তুত কী, এই যেমন আছি, তেমনিই যাব। দেখো তো মা আমার ঘোড়াটা এল কি না।"

রানি উঠে গেলেন। হাম্বিরের ঘোড়া প্রস্তুত হয়ে এল। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "দেখা যাক মা, পুরোনো তালোয়ার, দাগি ছোরা আর এই বেতো ঘোড়াটা নিয়ে কতদূর কী করতে পারি।"

মা আশীর্বাদ করলেন, "জয়ী হও।"

হাম্বির সেকেলে তলোয়ার কোমরে গুঁজে সামান্য বেশে সেই বেতো ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে এল। সূর্য অস্ত গেলেন। হাম্বিরকে নিয়ে সেই বেতো গোড়া খটর্-খটর্ করে গ্রাম ছাড়িয়ে বনের পথে প্রবেশ করলে।

আরাবল্লি পর্বতের নিবিড় বনচ্ছায়ায় ঘোর অন্ধকার। দু-হাত তফাতে লোক চেনা যায় না। হাম্বির তাঁর বেতো ঘোড়াটিকে একদিকে ছেড়ে দিয়ে কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে সেই বনের অন্ধকারে লুকিয়ে পড়লেন। ছায়ার সঙ্গে যেন একটা ছায়া মিলিয়ে গেল। যেমন শিকারের সন্ধানে বাঘ ফেরে, তেমনি সেই অন্ধকার বলে হাম্বির নিঃশব্দে অতি সন্তর্পণে গিরি-নদীর পারে-পারে, ঘনবনের ধারে-ধারে, পাহাড়ের গহ্বরে-গহ্বরে ডাকাতের সন্ধান করে চললেন। তৃষ্ণার সময় নদীর জল, ক্ষুধার সময় গাছের ফল, ঘুমের সময় পর্বতের গহ্বর, এমনি করে হাম্বিরের দিন কেটে চলল। যে সব মহাবনে মানুষের চলাচল নেই—দিবারাত্রি যেখানে কেবল সবুজ অন্ধকার আর বাঘ-ভালুকের গর্জনে পরিপূর্ণ; দিনের পর দিন হাম্বির সেই মহাবনের ভিতরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; বনের আর অন্ত নেই।

একদিন ঘোর অমাবস্যার রাত্রি—বনের ভিতর দিয়ে পথ দেখে চলা অসম্ভব, হাম্বির একটা প্রকাণ্ড শালগাছে চড়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছেন আর মনে-মনে ভাবছেন, দূর কর ছাই, ডাকাতের সন্ধান কি পাওয়া যাবে না? আজ তো এই অন্ধকারে পথ চলা অসম্ভব। আজ রাত্রি দেখছি এই গাছেই কাটাতে হল। উঃ, বনের তলায় মশাগুলো ভনভন করে ডাকছে দেখো। আবার ওই যে বাঘের গর্জন ঘন-ঘন শোনা যাচ্ছে। এত মশার ভনভনানি আর বাঘের গর্জন কোনো দিন তো শুনিনি। যাই হোক আজ রাত্রিতে আর মাটিতে পা দেওয়া নয়। এ বনটায় তত গাছপালা নেই কিন্তু জীব-জন্তু দেখছি অনেক আছে। হাম্বির নিজেকে বেশ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে নিদ্রা গেলেন।

অনের রাত্রে হাম্বিরের ঘুম ভাঙল। হাম্বির দেখলেন আকাশের একদিকে রাঙা আলো দেখা দিয়েছে। সকাল হয়েছে ভেবে হাম্বির উঠে বসলেন, কিন্তু সকাল হল

তো পাখি ডাকে না কেন? তবে ভ্রম হল নাকি? হাম্বির বেশ করে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। সেই সময় যেন দুজন মানুষে সেই শালগাছের তলায় কথা কইছে শোনা গেল! লোক দুটোর কথা বোঝা গেল না কিন্তু দু-একবার মুঞ্জ ডাকাতের আর সুজন বাহাদুরের নাম বেশ স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

হাম্বির আস্তে-আস্তে গাছের ডাল বেয়ে খানিকটা নেমে এসে কান পেতে শুনতে লাগলেন, দুই পাহাড়িতে কথা হচ্ছে, "ওরে ভাই বদরী, তুই এখনও মুঞ্জ-মুঞ্জ বলিস, তাই তো সে চটে যায়।"

"মুঞ্জকে মুঞ্জ বলব না তো কি? সে কী জানে না যে আমি তার চাচা হলেম?"

"ওরে ভাই, সে কী এখনও চাচা-ফাচা মানে? যেদিন থেকে সে সেই রাজপুতগুলোকে আর রানার ছেলেকে লড়াইয়ে হারিয়ে দিয়েছে, সেইদিন থেকে তার মাথা বিগড়ে গেছে। সে এখন চায় আমরা তাকে রানা আর তার ছেলেকে কুমার বলি।"

"রেখে দে তোর রানা, রেখে দে তোর কুমার। আমি তাদের চিরকাল বলব মুঞ্জ আর ভুঞ্জ।"

"তবে ভাই রঞ্জু, আজ তুই লাচ দেখতে চলেছিস কেন! সর্দার আজ মেয়ের বিয়েতে মৌয়া খেয়ে নেশা করেছে—তোকে দেখলেই মাথা কাটতে আসবে।"

"ওরে একি বলিদানের মোষ পেয়েছিস যে টুক করে হাড়িকাঠে মাথা দেব? চল এখন নাতনির বিয়েতে একটু আমোদ করা যাক; বাজে কথায় কেবল রাত কাটালি।"

লোক দুটো হন-হন করে উত্তর-মুখো চলল। হাম্বির এতক্ষণে বুঝলেন, তিনি ডাকাতের আড্ডায় এসে পড়েছেন। দূর থেকে মাদল আর ঝাঁঝরের হুমহুম ঝুমঝুম আওয়াজ অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মশালের আলো আকাশের একদিক রাঙা করে তুলেছে। হাম্বির তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে সেই লোক দুটোর সঙ্গ নিলেন।

কতদিন কেটে গেছে, সুজন বাহাদুর ডাকাত ধরতে না পেরে কৈলোরের কেল্লায় ফিরে এসেছেন। হাম্বিরের কিন্তু কোনো খবর নেই। সকলেই বলছে নিশ্চয় তিনি ডাকাতের হাতে কাটা পড়েছেন। এমন সময় একদিন মহারানার সভায় হাম্বিরের এক পত্র এল। হাম্বির উজলাগ্রাম থেকে লিখেছেন—তিনি উজলা গ্রামে মুঞ্জ বাহাদুরকে মেবারের রানা করে রাজসিংহাসন দিয়েছেন। নতুন রানা হাম্বিরকে

কৈলোরের কেল্লা আর একশোখানা গ্রাম জায়গির দিয়েছেন। অজয়সিংহ যদি সহজে কেল্লা ছেড়ে দেন তো ভালো, নচেৎ লড়াই নিশ্চয়! এবং মুঞ্জ বাহাদুর সশরীরে সগণে এসে কেল্লা দখল করবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।

শুনে সুজনসিংহ বলে উঠলেন, "দেখলে, ছোকরার কাণ্ডটা দেখলে একবার। সে কী মনে করেছে, দুমুঠো ডাকাতের দল নিয়ে মেবারের সিংহাসন দখল করবে? এত বড়ো তার স্পর্ধা।"

অজয়সিংহ বললেন, "হাম্বির কী এতদূর নীচ হবে? এ তো আমার বিশ্বাস হয় না। চিঠিটা কেমন-কেমন শোনাচ্ছে না?"

রাজমন্ত্রী বললেন, "কথাটা যদিও বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু বলাও যায় না। আমার মনে হয় প্রস্তুত হয়ে থাকাই ভালো। আজকালের ছেলে কখন কী করে বসে বলা যায় না।"

সুজনসিংহ বললেন, "তবে একবার মেবারের সমস্ত সামন্ত-সর্দারকে খবর পাঠানো হোক।"

অজয়সিংহ বললেন, "তাতে কাজ নেই। এ কী পাঠান বাদশা আসছে, যে সামন্ত-সর্দারকে খবর পাঠাতে হবে? লোকে যে হাসবে! সকলকে সাবধানে থাকতে বলো। হঠাৎ কেল্লায় ডাকাতি না হয়। হাম্বিরকে লিখে দাও যেন এমন দুঃসাহসের কাজ না করে। আর একদল সৈন্য নিয়ে তুমি উজলাগ্রাম থেকে ডাকাতের দল তাড়িয়ে দাও গে; আর পারো তো হাম্বিরকে বেঁধে আনো।"

সুজনসিংহ "যে আজ্ঞ" বলে উঠে গেলেন। কিন্তু তিনি মুঞ্জ ডাকাতের হাতে একবার পড়েছিলেন। সে যে কেমন সহজ ডাকাত, বেশ চিনেছেন। ঘরে গিয়ে রাজবৈদ্যকে দিয়ে মহারানাকে বলে পাঠালেন, শরীর তাঁর বড়ো অসুস্থ; কিছুদিন বিশ্রাম করতে পারলে ভালো হয়। ডাকাত ধরতে সেনাপতিকে পাঠালে চলে না?

অজয়সিংহ বললেন, "আচ্ছা তাই হবে!"

সেদিন রাত্রে অজয়সিংহ লছমিরানির সঙ্গে দেখা করে হাম্বিরের পত্র দেখালেন। রানিমার অন্দর-মহলে সেনাপতির তলব হল। তারপর হাম্বিরের নামে চিঠি নিয়ে সেনাপতি বিদায় হলেন। তাঁর উপর হুকুম রইল—হাম্বিরের পরামর্শ মতো খুব সাবধানে কাজ করবে।

এদিকে উজলাগ্রামে শেয়ালরাজার মতো মুঞ্জ বাহাদুর রাজসিংহাসন আলো করে বিরাজ করেছেন। ডাইনে বামে গম্ভীরমল আর চুয়োমল দুই নতুন মন্ত্রী কানে কলম গুঁজে বসে আছেন। আর রাজসভায় আছেন হাম্বির আর উজলাগ্রামের দু-এক পেট-মোটা জোতদার আর দু-চার কালো মুস্কো পাহাড়ি ভিল।

একজন গরিব প্রজা খাজনা দিতে পারেনি, রাজার লোক তাকে বেঁধে এনেছে। মুঞ্জরাজা হুকুম দিলেন, "ওর মাথা কাট।" অমনি হাম্বির কানে-কানে বললেন, "এরকম করলে প্রজালোকে খাপ্পা হবে। ওকে কিছু বকশিশ দিতে হুকুম হোক।" অমনি দুই মোহর ইনাম হয়ে গেল, গরিব প্রজা দুই হাতে সেলাম ঠুকে বিদায় হল। মনে-মনে বললে, "রাজা তো হাম্বির, এটা তো ডাকাতের সর্দার, ওর কি দয়া-মায়া আছে?"

এমন সময়ে কৈলোরের কেল্লা থেকে সেনাপতি এসে মুঞ্জ বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করলেন। কথা স্থির হল মহারানা কৈলোরের কেল্লা হাম্বিরকে দিয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে কাশীবাস করুন, তাঁর খরচ-পত্র রাজভাণ্ডার থেকে দেওয়া হোক, আর হাম্বির ভিল রাজার মন্ত্রী হয়ে রাজ্যশাসন করুন, সেজন্য তাঁকে সমস্ত খরচ-খরচা ও মাসিক ছ-হাজার তন্‌খা ও চিতোরের কেল্লা জায়গির দেওয়াই স্থির।

গম্ভীরমল শর্ত আওড়ালেন, চুয়োমল, একরারনামা লিখে হুজুরে পেশ করলেন, কিন্তু হুজুর তো পড়তে জানেন কত—কলম হাতে হাম্বিরের দিকে চাইলেন।

হাম্বির বললেন, "এ সব পাকা দলিলে কলমের সই দেওয়া ভালো নয়। আমি বলি মহারাজ এতে পাঞ্জা মোহর করে দিলেই ভালো হয়।"

মুঞ্জবাহাদুর দুই হাতে কালি মেখে দলিলের পিঠে হাতের ছাপ লাগালেন। সেনাপতি দলিল নিয়ে বিদায় হলেন। মুঞ্জবাহাদুর হাম্বিরের দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে বললেন, "এ তো বড়ো মজা। লড়াই নেই, হাঙ্গামা নেই, এক হাতের ছাপেই কাজ সাফ? দিল্লির বাদশাকে এমনি একটা পাঞ্জা পাঠিয়ে চিতোরের কেল্লাটা দখল নিলে হয় না?

হাম্বির বললেন, "আগে মেবার দখল করে নেওয়া যাক, তারপর দিল্লি পর্যন্ত ঠেলে যাওয়া যাবে। এখন একটু আমোদ-আহ্লাদের হুকুম হোক। রানার সেনাপতি আমাদের জাঁকজমক দেখে যাক।"

মুঞ্জরাজা বললেন, "বন্ধু, তুমি যেমন ভালো বোঝ করো, কিন্তু দেখো, মাদলের বাজনা আর মহুয়ায় কলশিটা ভুলো না। এ দুটো না থাকলে আমোদ হবে না।"

হাম্বির ভারে-ভারে মহুয়ার কলশি, দলে-দলে মাদলের ব্যবস্থা করলেন। উজলাগ্রামে ভিল-রাজার রাজপ্রাসাদে আমোদের ফোয়ারা খুলে গেল। সেনাপতি এলেন, গম্ভীরমল এলেন, চুয়োমল এলেন, হাম্বির এলেন, গ্রামের প্রজালোক পাড়া-প্রতিবাসী যে যেখানে ছিল সকলে এল। আর সেই সঙ্গে সাদা কাপড়ে ভদ্রলোক সেজে একদল রাজপুত সৈন্য! রাত্রি প্রায় শেষ হয়েছে, গ্রামবাসীরা যে-যার ঘরে ফিরেছে; ভিলের দল মহুয়ার কলশি খালি করে যেখানে-সেখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে, সেই সময় হাম্বির তাঁর বেতো ঘোড়ার পিঠে একটা রক্তমাখা চটের থলি চাপিয়ে উজলাগ্রাম থেকে বিদায় হলেন। সেনাপতির উপর ভিল-রাজার রাজপ্রাসাদ জ্বালিয়ে দেবার হুকুম রইল।

হাম্বির যেমন সন্ধ্যাবেলায় বেতো ঘোড়ায় চড়ে কৈলোরের কেল্লা থেকে বেরিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি সন্ধ্যাবেলা সেই বেতো ঘোড়ায় চড়ে কতদিন পরে রাজমুকুটসমেত মুঞ্জ ডাকাতের মুণ্ড নিয়ে ফিরে এলেন। কেল্লায় জয়জয়কার পড়ে গেল!

মহারানা সেই ভিলের কাঁচা রক্তে হাম্বিরের কপালে রাজটীকা লিখে দিয়ে বললেন, "রাজপুতের নিয়ম সিংহাসনে বসবার আগে টীকাজের ব্রত সাঙ্গ করতে হয়। আজ এই শত্রুর রক্তে তোমার এই ব্রত উদ্‌যাপন হল। আজ থেকে সিংহাসন তোমার, রাজমুকুট তোমার। কিন্তু মনে রেখো, মেবারের মুকুট উদ্ধার হল বটে, রাজ্য এখনো পাঠানের হস্তগত।" তারপর মহারানা সুজনসিংহকে ডেকে পাঁচ হাতিয়ার আর এক ঘোড়া দিয়ে বললেন, "তুমি মেবার ছেড়ে দক্ষিণ দেশে যাও। সেখানে তোমার ক্ষমতা থাকে তো নতুন রাজত্ব করো গিয়ে। মনে ভেবো না যে তোমাকে আমি স্নেহ করি না, কিন্তু আমি বেশ বুঝছি, তোমার নির্বাসনে মেবারের মঙ্গল, তোমারও মঙ্গল। আর যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তবে তোমার সন্তানেরা একদিন দক্ষিণ দেশে অখণ্ড রাজ্য বিস্তার করবে। যাও, মনে রেখো তুমি সূর্যবংশের সন্তান, তোমা হতে যেন সে বংশের কলঙ্ক না হয়। নিজের উপর নির্ভর করো, তবেই বড়ো হতে পারবে।"

অচেনার আনন্দ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবার বাড়ি হইতে যাইবার সময় হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল—বাড়ি থেকে কিছু খেতে পায় না, তবুও বাইরে বেরুলে দুধটা, ঘিটা—ওর শরীরটা সারবে এখন।

অপু জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনও যায় নাই। এ গাঁয়েরই বকুলতলা, গোসাঁইবাগান, চালতেতলা, নদীর ধার—বড়োজোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক—এই পর্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে মাঝে বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়িলে তাহার মা বৈকালে নদীর ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিত। নদীর ওপারের খড়ের মাঠে বাবলা গাছে গাছে হলুদ রং-এর ফুল ফুটিয়া থাকিত, গোরু চরিত, মোটা গুলঞ্চলতাদুলানো শিমুল গাছটাকে দেখিলে মনে হইত যেন কতকালের পুরাতন গাছটা। রাখালেরা নদীর ধারে গোরুকে জল খাওয়াইতে আসিত, ছোট্ট একখানা জেলেডিঙ্গি বাহিয়া তাহাদের গাঁয়ের অক্রুর মাঝি মাছ ধরিবার দোয়াড়ি পাতিতে যাইত, মাঠের মাঝে মাঝে ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল বৈকালের ঝিরঝিরে বাতাসে দুলিতে থাকিত—ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ এক-একদিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া দূর গ্রামের সবুজ বনরেখার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেদিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যাইত—সে সব প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে জানিত না। শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে বলিত—দিদি দিদি, দ্যাখ্ দ্যাখ্ ওইদিকে—পরে সে মাঠের শেষের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত—ওই যে? ওই গাছটার পিছনে? কেমন অনেক দূর, না?

দুর্গা হাসিয়া বলিত—অনেক দূর—তাই দেখাচ্ছিলি? দূর, তুই একটা পাগল!

আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাইরে পা দিল। কয়েকদিন পূর্ব হইতেই

উৎসাহে তাহার রাত্রিতে ঘুম হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল, দিন গুনিতে গুনিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাহাদের গ্রামের পথটি বাঁকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে আষাঢু-দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল—বাবা, যেখান দিয়ে রেল যায় সেই রেলের রাস্তা কোন্ দিকে?

তাহার বাবা বলিল—সামনেই পড়বে এখন, চলো না। আমরা রেল লাইন পেরিয়ে যাব এখন—

সেবার তাহাদের রাঙি গাইয়ের বাছুর হারাইয়াছিল। নানা জায়গা খুঁজিয়াও দুই তিন দিন ধরিয়া কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সে তার দিদির সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে বাছুর খুঁজিতে আসিয়াছিল। পৌষ মাস, খেতে খেতে কলাই গাছের ফলে দানা বাঁধিয়াছে, সে ও তাহার দিদি নীচু হইয়া খেত হইতে মাঝে মাঝে কলাই ফল তুলিয়া খাইতেছিল—তাহাদের সামনে কিছুদূরে নবাবগঞ্জের পাকারাস্তা, খেজুর গুড় বোঝাই গোরুর গাড়ির সারি পথ বাহিয়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিতে করিতে আষাঢুর হাটে যাইতেছিল।

তাহার দিদি পাকা রাস্তার ওপারে বহুদূরে ঝাপসা মাঠের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কী দেখিতেছিল, হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, — এক কাজ করবি অপু, চল যাই আমরা রেলের রাস্তা দেখে আসি, যাবি? অপু বিস্ময়ের সুরে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—রেলের রাস্তা—সে যে অনেক দূর! সেখানে কী করে যাবি?

তাহার দিদি বলিল—বেশি দূর বুঝি! কে বলেচে তোকে—ওই পাকা রাস্তার ওপারে তো—না?

অপু বলিল—নিকটে হলে তো দেখা যাবে? পাকা রাস্তা থেকে দেখা যায়—চল্ দিকি দিদি, গিয়ে দেখি।

দুইজনে অনেকক্ষণ নবাবগঞ্জের সড়কে উঠিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি বলিল—বড্ড অনেক দূর, না? যাওয়া যাবে না—

— কিছু তো দেখা যায় না—অত দূরে গেলে আবার আসব কী করে? তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু দূরের দিকে আবদ্ধ ছিল, লোভও হইতেছিল, ভয়ও হইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদি মরিয়াভাবে বলিয়া উঠিল—চল্ যাই দেখে আসি অপু—কতদূর আর হবে? দুপুরের আগে ফিরে আসব এখন, হয়তো রেলের গাড়ি

যাবে এখন—মাকে বলব বাছুর খুঁজতে দেরি হয়ে গেল—

প্রথমে তাহারা একটুখানি এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিল কেহ তাহাদিগকে লক্ষ করিতেছে কি না। পরে পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িয়া দুপুর রোদে ভাই-বোনে মাঠ বিল জলা ভাঙিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে ছুটিল। দৌড়, দৌড়, দৌড়—নবাবগঞ্জের লাল রাস্তা ক্রমে অনেক দূর পিছাইয়া পড়িল—রোয়ার মাঠ, জলসত্রতলা, ঠাকুর-ঝি পুকুর বামধারে, ডানধারে দূরে দূরে পড়িয়া রহিল—সামনে একটা ছোটো বিল নজরে আসিতে লাগিল। তাহার দিদি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—মা টের পেলে কিন্তু—পিঠের ছাল তুলবে। অপু একবার হাসিল—মরিয়ার হাসি। আবার দৌড়, দৌড়, দৌড়—জীবনে এই প্রথম বাধাহীন, গণ্ডিহীন, মুক্তির উল্লাসে তাহাদের তাজা তরুণ রক্ত তখন মাতিয়া উঠিয়াছিল—পরে কী হইবে, তাহা ভাবিবার অবসর কোথায়?

পরে যাহা হইল, তাহা সুবিধাজনক নয়। খানিক দূরে গিয়া একটা বড়ো জলা পড়িল একেবারে সামনে—হোগলা আর শোলা গাছে ভরা, তাহার উপর তাহার দিদি পথ হারাইয়া ফেলিল—কোনো গ্রামও চোখে পড়ে না—সামনে কেবল ধানখেত, জলা, আর বেত-ঝোপ। ঘন বেতবনের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় না, পাঁকে জলে পা পুঁতিয়া যায়, রৌদ্র এমন বাড়িয়া উঠিল যে, শীতকালেও তাহাদের গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল—দিদির পরনের কাপড় কাঁটায় নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গেল, তাহার নিজের পায়ে দু-তিনবার কাঁটা টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে হইল—শেষে রেলরাস্তা দূরের কথা, বাড়ি ফেরাই মুস্কিল হইয়া উঠিল। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, পাকা রাস্তাও আর দেখা যায় না, জল ভাঙিয়া ধানখেত পার হইয়া যখন তাহারা বহু কষ্টে আবার পাকা রাস্তায় আসিয়া উঠিল তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। বাড়ি আসিয়া তাহার দিদি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তবে নিজের ও তাহার পিঠ বাঁচাইল।

সেই রেলের রাস্তা আজ এমনি সহজভাবেই সামনে পড়িবে—সেজন্য ছুটিতে হইবে না, পথ হারাইতে হইবে না—বকুনি খাইতে হইবে না।

কিছু দূর গিয়া সে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের মতো একটা উঁচু রাস্তা মাঠের মাঝখান চিরিয়া ডাইনে বাঁয়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙা রাঙা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে সারি দেওয়া। সাদা সাদা লোহার খুঁটির উপর যেন একসঙ্গে অনেক দড়ির টানা বাঁধা—যতদূর দেখা যায়, ওই সাদা

খুঁটি ও দড়ির টানা বাঁধা দেখা যাইতেছে—

তাহার বাবা বলিল—ওই দ্যাকো খোকা, রেলের রাস্তা—

অপু একদৌড়ে ফটক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। পরে সে রেলপথের দুইদিকে বিস্ময়ের চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন? উহার উপর দিয়া রেলগাড়ি যায়? কেন? মাটির উপর দিয়া না গিয়া লোহার ওপর দিয়া যায় কেন? পিছলাইয়া পড়িয়া যায় না? কেন? ওগুলোকে তার বলে? তাহার মধ্যে সোঁ সোঁ কীসের শব্দ? তারে খবর যাইতেছে? কাহারা খবর দিতেছে? কী করিয়া খবর দেয়? ওদিকে কি ইস্টিশান? এদিকে কি ইস্টিশান?

সে বলিল—বাবা, রেলগাড়ি কখন আসবে? আমি রেলগাড়ি দেখব বাবা।

—রেলগাড়ি এখন কী করে দেখবে? ... সেই দুপুরের সময় রেলগাড়ি আসবে, এখনও দু-ঘণ্টা দেরি!

—তা হোক বাবা, আমি দেখে যাব, আমি কখ্খনো দেখিনি—হ্যাঁ বাবা—

—ও রকম কোরো না, ওই জন্য তোমায় কোথাও আনতে চাইনে—এখন কী করে দেখবে? সেই দুপুর একটা অবধি বসে থাকতে হবে তা হলে এই ঠায় রোদ্দুরে, চল্ আসবার দিন দেখাব।

অপুকে অবশেষে জল-ভরা চোখে বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

তুমি চলিয়া যাইতেছ...তুমি কিছুই জানো না, পথের ধারে তোমার চোখে কী পড়িতে পারে, তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিককে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে—নিজের আনন্দের এ হিসাবে তুমিও একজন দেশ-আবিষ্কারক। অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই। আমি যেখানে আর কখনও যাই নাই, আজ নতুন পা দিলাম, যে নদীর জলে নতুন স্নান করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর জুড়াইল, আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল কি না, তাহাতে আমার কী আসে যায়? আমার অনুভূতিতে তাহা যে অনাবিষ্কৃত দেশ। আমি আজ সর্ব প্রথম মন, বুদ্ধি, হৃদয় দিয়া উহার নবীনতাকে আস্বাদ করিলাম যে!

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চা

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বিজ্ঞানের ইতিহাসের আলোচনা এদেশীয়রাই শুরু করলেন। পথিকৃৎ হিসাবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাম মনে করতে হবে। আচার্য রায় বিদেশে রসায়নে কৃতবিদ্য হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেশে ফিরে এসে কীভাবে নতুন করে রাসায়নিক শিল্পের পুনরুজ্জীবন করা যায়, আবার অন্যদিকে অন্বেষণ আরম্ভ করলেন প্রাচীন পুথি ইত্যাদি, যার মধ্যে প্রাচীন কালের খবর পাওয়া যাবে।

নিজের অধ্যাপনা ও গবেষণা চালিয়ে পরে যে অবসর মিলত, তা সব ব্যয় করতেন পুরাতন পুথি থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে। সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্যে অনেক পুরানো তথ্য উদ্‌ঘাটিত হল। বৈদ্যক শাস্ত্রের আদি গ্রন্থগুলি পরীক্ষা করে অনেক প্রয়োজনীয় খবর পেলেন। পুরাকাল থেকেই হিন্দুরা ক্ষার ও অম্লকের প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করেছিলেন। লোহা, সিসা, তামা, রঙ্গ (টিন), পারদ ইত্যাদি ধাতুদের বিশুদ্ধ অবস্থায় আনতে পারতেন। নানা শোধনক্রিয়া তাঁরা অনুসরণ করতেন। ধাতুভস্ম প্রস্তুত করার অনেক উন্নত প্রণালী তাঁদের জানা ছিল। স্বল্পায়াসেই রাসায়নিক নানা প্রক্রিয়ার জন্য তাঁরা নানা যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন। ঊর্ধ্বপাতন, অধঃপাতন, তির্যকপাতন প্রক্রিয়ার ফলে তাঁরা যেসব রাসায়নিক তথ্যে উপনীত হয়েছিলেন, তা সত্যিই আমাদের সকলকে বিস্মিত করবে। পুথির অনেকগুলি পারদের নানা রূপান্তর বর্ণনা করেছে। গন্ধকের সঙ্গে নানা ধাতুর যৌগিক পদার্থ অনেকগুলি তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। হিন্দু রাসায়ন ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশ হল ১৯০২ সালে। পরে দ্বিতীয় খণ্ড লেখা শেষ হল ১৯০৮ সালে। বহু বৎসর পরিশ্রম করে হিন্দুদের বিজ্ঞানচর্চার এক নতুন অধ্যায়ের খবর দিয়ে বিশ্বের পণ্ডিতমহলে এক বরেণ্য স্থান অধিকার করলেন আচার্য রায়। এ দেশ থেকে

গণিতের অনেক আবিষ্কার যে আরবজাতির মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তা কোলব্রুক সাহেব আগেই দেখিয়েছিলেন। আচার্য রায় দেখালেন—প্রাচীনকালে রসায়নের অনেক তথ্য ভারতে প্রথমে আবিষ্কৃত হয়ে পরে মুসলমানদের মাধ্যমে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। চরক ও সুশ্রুতের অনুবাদের সঙ্গে রাসায়নিক অনেক ভারতীয় প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়িয়ে গিয়েছিল। অল্প কিছুদিন আগে আচার্য রায়ের সুযোগ্য ছাত্র অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য আচার্য রায়ের হিন্দু-রসায়নের ইতিহাসের একটা সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ছাপিয়েছেন।

গত চল্লিশ বৎসরে নানবিধ আবিষ্কারের ফলে আমরা প্রাচীন আর্যজাতির জ্ঞানের পরিধির একটা নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাচ্ছি। মহেঞ্জোদাড়োর যুগ প্রায় আজ থেকে চার হাজার বৎসর আগে। উৎখননে সেই সময়কার নানা শিল্পদ্রব্য আজ আবিষ্কৃত হয়েছে। আমরা জেনেছি এ দেশেই প্রথমে নানা রঙের কাচ প্রস্তুত হত। ব্রোঞ্জ ও কাংস্য ধাতুর তৈরি নানা উপকরণও আমরা পেয়েছি। পরে নানা স্থানে তার ব্যবহার আজ চলেছে দেখতে পাই। এদেশেই যে বিশুদ্ধ লোহা প্রস্তুত হত ও নানাদেশে রপ্তানি হত তার খবরও মিলেছে। ইস্পাত তৈরির রহস্যও ভারতের আবিষ্কার। বিখ্যাত দামাস্কাস ও টলেডোর তরবারি নির্মাণে যে ভারতীয় ইস্পাত ব্যবহার হত এ জেনে দেশের সকলের গর্ব অনুভব করার কথা।

আচার্য শীলের গবেষণার কথা বলে এই প্রবন্ধের শেষ করব। ইনি বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক। জন্মেছিলেন ১৮৬৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। অলোকসামান্য প্রতিভাধর ইনি। অল্প বয়সের মধ্যেই গণিত, বিজ্ঞান, নানা ভাষা, কাব্য ও দর্শনের চর্চা করে যশস্বী হয়েছিলেন। আচার্য রায় যখন হিন্দু রসায়নের ইতিহাস লিখছেন, আচার্য শীল তখন তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর পুস্তকের শেষে এক অধ্যায় বর্ণনা ছিল প্রাচীন হিন্দুদের বস্তু-উৎপত্তি ও গুণের বিষয়ে নানা তত্ত্বকথা। সাংখ্য দর্শনে, যে সাধারণ নিয়মে বিশ্বের বিবর্তন হয়েছে, আবার বেদান্ত, মীমাংসা ও বৌদ্ধশাস্ত্র বা চরকের মতবাদে যে বস্তুর রাসায়নিক ও ভৌমিক গুণের উৎপত্তি নিয়ে যেসব জল্পনা-কল্পনা আছে তার একটা চিন্তামূলক বিবৃতি দিয়েছেন আচার্য শীল। ব্যাসভাষ্য, চরকসংহিতার, উদ্দ্যোৎকারের বর্তিকা, প্রশস্তপাদের ভাষ্য ও বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতার উপর মুখ্যত নির্ভর করেছিলেন তিনি। অরূপ প্রকৃতি থেকে কীভাবে সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণের বৈষম্যের ফলে সারা বিশ্বের প্রকাশ হল!

পঞ্চভূতের তন্মাত্র থেকে কীভাবে স্থূলকণায় এসে ঠেকল সৃষ্টি। আবার স্থূলকণা সংযোগ ও বিশ্লেষণের ফলে কীভাবে আপাতদৃশ্যত বস্তুর মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ প্রকাশ পেয়েছে—হিন্দু, বৌদ্ধ দার্শনিকরা কীভাবে দৃশ্য জগতের আকাশ-বাতাস-জল-স্থলের অবস্থান ও ব্যবহার বুঝতে চেষ্টা করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন।

বিভিন্ন জাতীয় দর্শনবাদের তুলনামূলক পর্যালোচনাই আচার্য শীলের কাম্য—তাই যেসব স্থূল জ্ঞানসমষ্টির উপর দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে—যেমন ভাষাতত্ত্ব বা শারীরবৃত্ত বা জ্যামিতিক বা গাণিতিক পরিকল্পনা—সবই দর্শনে প্রতিফলিত হয়। আমরা আজ যেমন একদিকে গ্রিক জাতির জ্ঞান সংগ্রহের পরিচয় পেয়েছি তেমনি হিন্দু জাতির এইসব বুনিয়াদি জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় করানোই তাঁর বই লেখার প্রধান উদ্দেশ্য। নজির হিসাবে সর্বত্র সংস্কৃত মূল উদ্ধৃত করে আচার্য শীল চেয়েছিলেন লোকের মনে বিশ্বাস আনতে যে একটি কথাও তাঁর স্বকপোলকল্পিত নয়। তাই হিন্দু শাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা করতে এই বইয়ের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করবেন।

[তাঁর] বইয়ের মধ্যে আছে নানা খবর। রসায়নশাস্ত্র থেকে নানাজাতীয় পদার্থের বর্ণনা, তাদের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ—পারদ, তাম্র, রঙ্গ, অভ্র, নাগভস্মের কথা। দূরত্ব ও কালের মান নির্ণয়ের খবর। জ্যোতিষ্কের ক্ষণিকী গতি গণনার খবর। ড. শীল বলছেন, নিউটনের অনেক আগেই হিন্দুরা বিভেদ-কলনের (Different Calculas) কয়েকটি সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন।

আবার বলেছেন, রঞ্জনশিল্পের কথা—কীভাবে উদ্ভিজ দ্রব্য ও ফিটকারির সাহায্যে হিন্দুরা রেশম ও কাপড় স্থায়ী রং করবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন এবং এর জন্য দেশ-বিদেশে [এদেশের] পণ্যের তাই এত আদর ও চাহিদা হয়েছিল।

আজকের দিনে দেশব্যপী আন্দোলন চলেছে ভারতকে অন্যান্য দেশের মতো বিজ্ঞানের ভিত্তিতে মুখ্যত শিল্পাশ্রয়ী করে তুলতে। কৃষিপ্রাণ ভারতবর্ষকে কি সত্যিই অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের মতো শিল্পের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের জীবনযাত্রার পরিকল্পনা করতে হবে? এই বিষয়ে আচার্য শীলের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী থেকে কয়েকটি লাইনের অনুবাদ করে তাঁর মত সকলের কাছে পৌছে দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করি।

"জাতীয় জীবনে কৃষি ও শিল্পের প্রতিযোগিতার কথা যেভাবে আমরা

সচরাচর ভাবতে বসি তা মূলত ভ্রমাত্মক। দুই-ই মৌলিক ও প্রয়োজনীয় কর্তব্য। ইংল্যান্ডে এখন একটি রব উঠেছে—'মাটির দিকে ফিরে চল'—এটা আমি স্বাস্থ্যকর ভঙ্গি বলে মনে করি। চিনের মতো ভারতবর্ষে কৃষি চিরকাল লোকের বুনিয়াদি ও প্রধান পেশা হয়ে থাকবে। আমি মনে করি কৃষি ও শিল্পে প্রচেষ্টার অনুপাত এদেশে ৩:১ এই হারে হওয়া উচিত। কৃষিকে করে তুলতে হবে আরও উন্নত ধরনের ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে যন্ত্রের ব্যবহার করতে হবে। সৌর ও বৈদ্যুতিক শক্তির আরও বেশি ব্যবহার বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। উৎপাদনের হার এইভাবে উচ্চাঙ্গের করে তুলে, এর বিপক্ষে যে অর্থনীতিমূলক আপত্তি তুলে বলা হয় বার বার কৃষি প্রচেষ্টার ফলে জমি থেকে ক্রমশ উৎপাদনের ও মুনাফার হার কমে যাবে—এটাকে খণ্ডন করতে হবে। সচরাচর বলা হয় শিল্পের তুলনায় কৃষির বিপক্ষে এইটি প্রধান কথা। এইভাবে ভারতে কৃষি প্রবর্তন করলে ও যন্ত্রের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে পারলে ভারতবর্ষের যে প্রকান্ড পুঁজি—তার লোকসংখ্যা ও তার বিস্তৃত ভূ-সম্পদ—তার সম্যক ব্যবহার করে আমরা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম লাইনে স্থান বজায় রাখতে পারব।"

ম্যাজিক লণ্ঠন

অন্নদাশংকর রায়

আমি যখন ছোটো ছিলুম আমাদের বাড়িতে অনেক পত্রিকা আসত। সেসব পত্রিকার আসল বিষয় ছেড়ে আমি পড়তুম কেবল বিজ্ঞাপন। আর বিজ্ঞাপনের মধ্যে সেই বিজ্ঞাপন অনুসন্ধান করতুম যার শীর্ষে থাকত "বিনামূল্যে"। বিনামূল্যে সোনার ঘড়ি ও চেন, বিনামূল্যে ভৌতিক আয়না, বিনামূল্যে গানের বই, চুলের কলপ, দাঁতের মাজন, গুপ্ত মন্ত্র, অক্ষয় কবচ। এর সবগুলো অবশ্য আমার কাজে লাগবার নয়। তবু পাওয়াই যাচ্ছে যখন বিনি পয়সায় তখন নিয়ে রাখলে ক্ষতি কী?

বাবাকে গিয়ে বলতুম, একখানা পোস্টকার্ড দাও। কাকে চিঠি লিখব জিজ্ঞাসা করলে বলতে লজ্জা করত সোনার ঘড়ি কোম্পানিকে। অগত্যা মিথ্যা বানিয়ে বলতুম ছোটো মাসিকে। কিংবা শ্রীরামপুরের সেই বন্ধুকে।

পোস্টকার্ড চাইলেই পাওয়া যেত। আর পেলেই নিজের হাতে লিখে স্বয়ং ডাকঘরের বাক্সে দিয়ে আসতুম। তারপর একদিন আসত ক্যাটালগ বা বিনামূল্যে ঘড়ি পাবার শর্ত। বাবার হাতে পড়লে তিনি আশ্চর্য হয়ে বলেন, তোর নামে কে এসব পাঠায়? আমি বলি, তাই তো। শ্রীরামপুরের বন্ধু নয় তো?

ক্রমে বুঝলুম বিনামূল্যে জিনিস পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় জিনিসের মূল্যতালিকা। অতএব বিনামূল্যে অন্বেষণে ক্ষান্তি দিলুম। এবার আমার লক্ষ্য হল অল্প মূল্যে কী কেনা যায়।

পূজাপার্বণে হাতখরচ যা পেতুম তার থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে ঠাকুমার কাছে গচ্ছিত রাখতুম আমি ও আমার ভাই তিনু। আমাদের দুই ভাইয়ের নামে এমনি করে প্রায় চার টাকা ও দু টাকা জমা ছিল। তা ছাড়া আমাদের পিসতুতো ভাই কিরণও আমাদের বাড়ি থেকে লেখাপড়া করত। তার নামে জমা ছিল টাকা তিনেক।

তিনজনে মিলে ঠিক করলুম তিনজনের তিন টাকায় আমরা কিনব একটা ম্যাজিক লণ্ঠন।

ম্যাজিক লণ্ঠন! ওঃ! তার মতো বিস্ময়কর আর কী আছে। বাপ রে বাপ রে বাপ! ম্যাজিক লণ্ঠন! পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য! একদিকে থাকবে আলো, অন্য দিকে পর্দা, পর্দার উপর ছবি ফুটে উঠবে, জীবন্ত ছবি। ঠাকুমাকে আভাস দিয়ে রাখলুম কোম্পানির কল আসছে, পৃথিবীর যা কিছু দেখতে চাও ঘরে বসে দেখতে পাবে। "তাই নাকি। কালীঘাটের কালী?" "নিশ্চয়। নিশ্চয়! কালীঘাটের কালী। আলিপুরের চিড়িয়াখানা। জাদুঘর।"

আমরা অজকাল চুপি চুপি পরামর্শ করি। কাউকে কাছে ভিড়তে দিইনে। পাছে ফাঁস হয়ে যায়। বাবা জানলে কপালে অনেক দুঃখ আছে। পড়াশুনা ফেলে আমরা এই নিয়ে খেপেছি। এর ক্ষমা নেই। লণ্ঠন এলে সেটাকে কোথায় লুকিয়ে রাখব, কোথায় পর্দা খাটানো হবে, সবাইকে কোথায় বসাব এসব ভেবে আমাদের বিষম উদ্‌বেগ।

মনের আগুন চাপা থাকে না। পাশের বাড়ির বীরেন সুরেনরা আমাদের শত্রু। তবু তারা কেমন করে টের পেল আমরা ম্যাজিক লণ্ঠন আনাচ্ছি। অমনি তাদের সুর বদলে গেল। "হ্যাঁরে, খবরটা কি সত্যি? আমরাও দেখতে পাব তো? একদিন কিন্তু আমাদেরও ধার দিতে হবে।" আমরাও রাজি হয়ে গেলুম। আমার মাথায় এক নতুন বুদ্ধি উদয় হল। বাবাকে বলা যাবে লণ্ঠনটা ওদের, আমরাই ধার করেছি।

বীরেনের সঙ্গে ঘন ঘন পরামর্শ চলতে থাকল। তার প্রতিভার তুলনা নেই। সে বললে, "হুঁ হুঁ। এ বড়ো সামান্য কল নয়। সামনেই রথযাত্রা। আমরা যাত্রীদের কলের বাজি দেখিয়ে অনেক টাকা রোজগার করব। এক এক আনা করে টিকিট। তারপর সেই টাকায় আমরা কিনব বায়োস্কোপ। পাঁজিতে লিখেছে ত্রিশ টাকায় বায়োস্কোপ হয়।"

তিন টাকায় ম্যাজিক লণ্ঠন থেকে ত্রিশ টাকার বায়োস্কোপ। এ যে বিড়াল বিক্রয়ে বড়োমানুষ। শুধু তাই নয়। খোঁড়া কার্তিকের সঙ্গে হবে আমাদের প্রতিযোগিতা। সেও রথের সময় ম্যাজিক দেখায়। কিন্তু তার তো কল নেই, আছে একটি লোহার শিক যা সে জিভের ভিতর দিয়ে চালিয়ে দেয়, একটি ফুটো ঘটি যা দিয়ে জল পড়ে না, এই সব।

বীরেন বললে, "দ্যাখ, কল তো এসে পড়ল বলে। কিন্তু পিয়ন যদি সোজা

তোর বাবার হাতে দেয়।" তা হলে তো চিত্তির। আমরা স্থির করলুম পিয়নকে মাঝ রাস্তায় পাকড়াব। কিন্তু একটিমাত্র পিয়ন। সে যে কখন কোন্ পথ দিয়ে যায়, তার সাথে সাথে ঘোরা তো চলে না। তখন আমরা পরামর্শ-পরিষৎ ডেকে সাব্যস্ত করলুম ডাকঘরের কেরানিবাবুর সঙ্গে ভাব করব। বীরেনই সে ভার নিল। তিনি পার্সেলটাকে পিয়নের হাতে দেবেন না, ইন্টিমেশনও আটক করবেন। বীরেন রোজ একবার খোঁজ নেবে সেটা এসেছে কি না।

একদিন সকালবেলা বীরেন আমার দিকে একখানা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বললে, ইন্টিমেশন। তিন টাকা দু-আনা সমেত এখানা দাখিল করলে পার্সেলটি তোর।"

এতকাল কেবল ক্যাটালগই আসত। এবার আমার নামে জলজ্যান্ত একটা পার্সেল এসেছে, আমার নামে। যা তা জিনিস নয়। ম্যাজিক লণ্ঠন। এখুনি ডাগঘর থেকে আনিয়ে নিয়ে এই বেলা পর্দা খাটিয়ে বাজি দেখাব। রাত্রের জন্য তুলে রাখব না। বীরেন বললে, "দল বেঁধে সবাই যদি ডাকঘরের দিকে রওনা হই নির্ঘাত ধরা পড়ব। একবার ভেবে দ্যাখ, কলকাতা থেকে আড়াইশো মাইল দূরে এসে কলটি ফেরত যাবে।" স্থির হল কেউ যাবে গলি দিয়ে, কেউ রাস্তা দিয়ে, কোনো দলে দুজনের বেশি থাকেব না।

আমরা নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথ নিলুম। আর পিছনে থাকল কিরণ, ঠাকুরমার কাছ থেকে আদায় করার ভার পড়ল তার উপরে।

এই যে ডাকঘর দেখা যাচ্ছে। বীরেন পৌঁছে গেছে। জানলার এপার থেকে কেরানিবাবুর সঙ্গে কথা কইছে সে। হয়তো এতক্ষণে পার্সেলটাও সিন্দুক থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু কই, কিরণ যে আসে না। তিনু আর আমি এগিয়ে যাব কি ছুটে গিয়ে কিরণকে তাড়া দেব, এই ভাবছি এমন সময় পিছন থেকে ডাক শুনলুম বাড়ির চাকর নবীনের। "খোকা বাবু, বাবা ডাকছেন"। সর্বনাশ। যা ভয় করেছিলুম তাই। বাবা জানতে পেরেছেন। আমারা দু-ভাই পার্সেলের মায়া কাটিয়ে হেঁট মুখে বাড়ি ফিরলুম। বাবার সামনে দাঁড়ালে তিনি চোখ পাকিয়ে শুধালেন, "পার্সেলের জন্যে কে চিঠি লিখেছিল?" এই বিপদে বীরেনের নাম করে থাকি তো পাঠকরা আমার মিথ্যাবাদিতার দোষ ধরবেন না। উত্তরকালে যারা গল্পলেখক হয় মিথ্যা বানিয়ে বলাই তাদের শিক্ষানবিশি।

বাবা হয়তো বিশ্বাস করলেন, কিন্তু কাকা ইতিমধ্যে একগাছি লকলকে বেত সংগ্রহ করেছিলেন। বিদ্যার প্রয়োগ না করে তিনি নিরস্ত্র হবেন এতটা ত্যাগ স্বীকার

তাঁর কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। কারণ তিনি তখনও ছাত্র। আমাদের দুই ভাইকে চাবকাতে চাবকাতে বারান্দার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি নিয়ে গেলেন। পাছে আমাদের মনে ক্ষোভ থাকে এজন্যে তিনি কিরণকেও বঞ্চিত করলেন না।

আমার মা আমাদের হাতে তিনটে আতা দিলেন। আমরা মারের যন্ত্রণা ভুলে আতার আস্বাদনে মন দিলুম। ওদিকে বেচারা বীরেন অশেষ ধৈর্যের সহিত আমাদের প্রতীক্ষা করে পরিশেষে চরের মুখে শুনল যে আমরা ধরা পড়ে মার খেয়েছি। তখন সেও চোখের জলে ভেসে বাড়ি ফিরল। সেই থেকে আবার আমাদের সঙ্গে তার আড়ি।

ম্যাজিক লণ্ঠন ওয়াপস গেল। আর আমাদের দুই ভাইয়ের টাকাও হল বাজেয়াপ্ত। যার টাকা নেই তার বিজ্ঞাপন পড়ে কোন্ সুখ? আমি বিজ্ঞাপন ছেড়ে আসল বিষয় পরলুম। পড়তে পড়তে মৌতাত ধরল। তখন মনে হল এই তো ম্যাজিক। চুরি করে বঙ্কিম গ্রন্থাবলি পড়লুম। বুঝি আর না বুঝি, প্রত্যয় হল, ম্যাজিক হচ্ছে এই। সাহিত্য হচ্ছে ম্যাজিক লুণ্ঠন। স্লাইড তার অসংখ্য, বিচিত্র, সবাক, বহুবাক, সজীব, অমর। পৃথিবীর প্রথম এবং চরম আশ্চর্য হচ্ছে সেই।

তারপর ক্রমে আবিষ্কার করলুম যে আমিও স্লাইড বানাতে পারি। এমনকি কোনো কোনো স্লাইড আমার হাতেই বনে ভালো। তখন আমি সাহিত্যের কারিগর হলুম।

গাছ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

একটা গাছ। অনেকদিনের গাছ। গাছটা সুন্দর কি অসুন্দর কেউ প্রশ্ন তোলেনি। গাছের মনে গাছ দাঁড়িয়ে আছে। এর প্রয়োজন আছে কি নেই তা কেউ মাথা ঘামায় না।

যেমন মানুষ মাথার ওপর আকাশ দেখে, পায়ের নীচে ধুলো দেখে ঘাস দেখে, তেমনি তারা চোখের সামনে একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে দেখছে। সন্ধ্যায় দেখছে, দুপুরে দেখছে, সকালে দেখছে। কেবল চোখ দিয়ে হৃদয় দিয়ে অনুভূতি দিয়ে দেখা নয়, বোঝা নয়, বা এমন করে একটা গাছকে বুঝতে হবে কেউ কোনোদিন চিন্তাও করে না।

দিনের পর দিন যায়, ঋতুর পরে ঋতু কাটে, বছরের পর বছর যায় আসে—গাছের জায়গায় গাছ দাঁড়িয়ে।

বর্ষায় পাতাগুলি বড়ো হয়, পুষ্ট হয়, শরতে পাতাগুলি ভারী হয়, মোটা হয়, সবুজ রং অতিরিক্ত সবুজ হয়ে কালোর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়, হেমন্তের মাঝামাঝি হঠাৎ সেই সবুজ-কালো গভীর রং ধূসর হয়ে ওঠে। তারপর শীতে হলদে ফ্যাকাসে নীরক্ত প্রসূতির পান্ডুর চেহারা ধরে পাতাগুলি ঝরে ঝরে পড়ে। গাছ বিরক্ত হয়।

তখনও গাছ গাছ থাকে।

গাছের চেহারা তখন শুধু কাঠের চেহারা হয়।

ছোটো কাঠ বড়ো কাঠ চিলতে কাঠ সরাকাঠ পাতলা চিকন মানুষের আঙ্গুলের মতো টুকরো-টুকরো অজস্র কাঠ—কাঠির একটা জবরজং কাঠামো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু তা বলে কি মানুষ তখন তার ওপর রাগ করে? করে না। কারণ মেঘমেদুর আকাশে নীচে অরন্যের চেহারা ধরে গাছ যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখন মানুষ তাকে

যে চোখে দেখে শীতের শুকনো আকাশের নীচে সরু মোটা কতগুলি কাঠ-কাঠির বোঝা মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাকলেও মানুষ তাকে সেই চোখে দেখে। তাই বলছিলাম ওপর-ওপর দেখা। মন দিয়ে দেখা নয় বোঝা নয়। তাহলে ফাল্গুনে লালে সবুজ মেশানো নতুন পাতার সমারোহ দেখে মানুষ নাচত অথবা বৈশাখ পড়তে অজস্র মঞ্জুরি মাথায় নিয়ে গাছটা আশ্চর্য গোলপি আভায় আকাশ আলো করে তুলেছে দেখে আনন্দে চিৎকার করত তা কেউ করে না, এ পর্যন্ত করেনি।

দু-তিনটি বাড়ির মাঝখানে এক ফালি পড়ো জমির ওপর একটা গাছ ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে তাদের একটু সুবিধা হয়, এই শুধু তাঁরা জানে। এ-বাড়ির মানুষ জানে, ও-বাড়ির মানুষ জানে, আশপাশের আরো গোটা দু-তিন বাড়ির মানুষগুলিও একটু-আধটু সুবিধা আদায় করতে গাছের কাছে আসে বই-কি, যেমন সকাল হতে খবর কাগজ হাতে দু-চারজন প্রৌঢ় বুড়ো গাছতলায় একত্র হয়ে রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি আলোচনা করে, যেমন দুপুরের দিকে এ-বাড়ির বুড়ি, ও-বাড়ির বুড়ি, এ-বাড়ির বউ, ও-বাড়ির মেয়ে গাছের নীচে সরু গালিচার মতন ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে রান্নার কথা, সেলাইয়ের কথা, ছেলে হওয়ার কথা, ছেলে না হওয়ার কথা বলে সময় কাটায়, আর বিকেল পড়তে ছুটে আসে ছেলে-ছোকরার দল। গাছটাকে ঘিরে হই-হল্লা, ছুটোছুটি, গাছে উঠে ডাল ভাঙা, পাতা ছেঁড়া, বা কোনদিন গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দোল খাওয়া।

বা শীতের দুপুরে গাছের ছায়ায় মাথা রেখে শরীরটা রৌদ্রে ছড়িয়ে দিয়ে কারো-কারো গল্পের বই পড়া। আবার গ্রীষ্মের রাত্রে ঠিক এই গাছের তলায় শীতলপাটি বিছিয়ে হ্যারিকেন জ্বেলে পাড়ার পাঁচ-সাতজন গোল হয়ে বসে তাস খেলছে এই দৃশ্যও চোখে পড়ে।

যখন মানুষ থাকে না তখন গাছতলায় ছাগলটাকে গোরুটাকে মাথা গুঁজে মনের আনন্দে ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে দেখা গেছে।

আর ওপরে নানাজাতের পাখির কিচিরমিচির কলরব, ডানা ঝাপটানো, ঠোঁটে ঠোঁট ঘষার শব্দ।

আর মাঝে মাঝে হাওয়ায় পাতা নড়ে, ডাল দুলে ওঠে।

বা এমনও এক-একটা সময় আসে, যখন পাখি থাকে না, বাতাস নেই। গাছ স্থির স্তব্ধ। পড়ো জমিতে নিবিড় ছায়াটুকু ফেলে অনন্তকালের সাক্ষী হয়ে নিঃসঙ্গ গাছ যেন যুগ-যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে, বা মনে হয় কোনো দার্শনিক। নীরব

থেকে অবিচল থেকে জগৎটাকে দেখছে। সংসারের উত্থান-পতন লক্ষ করছে। পাপের জয়, পুণ্যের পরাজয় দেখে বিমূঢ় বিস্মিত হয়ে গেছে।

চিন্তাশীল মানুষের মনের অবস্থা যেমন হয়। চিন্তাশীল মানুষ চুপ করে থাকে। সত্যিই গাছটাকে সময় সময় এমন একটি মানুষ বলে কল্পনা করা যায়। তখন তার কাছে অন্য মানুষ, পশুপাখি, হাওয়ার চাপল্য কল্পনা করতে কষ্ট হয়।

হয়তো এমন করে কেউ গাছটাকে দেখছিল, গাছটাকে নিয়ে ভাবছিল। এতদিন জানা যায়নি, এতদিন বোঝা যাচ্ছিল না। কে জানে হয়তো গাছটার সেই অন্তর্দৃষ্টি ছিল, গাছ বুঝতে পারছিল পুর্বদিকের একটা বাড়ির সবুজ জানলায় বসে একজন তাকে গভীরভাবে দেখছে লক্ষ করে। না, আগে হয়তো সে আর দশটি মানুষের মতো সাদা চোখে গাছের পাতা ঝরা দেখত, নতুন পাতানো গজানো দেখত। এখন আর তার চোখ সাদা নেই। কাজল পড়ে গভীর কালো হয়েছে। এখন আর হালকা বেণি ঝুলিয়ে ফ্রক উড়িয়ে সে যে ছটফট করছে না যে, বাড়ির সামনে পড়ো জমিতে একটা গাছ আছে কি বাঁশের খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে ওপর-ওপর দেখে শেষ করবে। এখন সে শান্ত গম্ভীর, মাথায় দৃঢ়বন্ধ সংযত কঠিন খোঁপার মতো তার মনও বুঝি সতর্ক সুসংবন্ধ, স্থির ও নিবিড় হয়ে উঠেছে। আর সেই নিবিড় মন সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে সারাক্ষণ সে গাছের দিকে তাকিয়ে আছে। গাছটাকে নিয়ে ভাবছে। যেন ভাবতে ভাবতে একদিন তার দৃষ্টি কেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। চোখের কলো পালকগুলি আর নড়ছে না, কালো মণিদুটি পাথরের মতো স্থির কঠিন হয়ে আছে। গাছ বুঝতে পারল একটা ভয়ংকর ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছে, ওই কালো পালক-ঘেরা চোখ দুটোর তাকানোর মধ্যে কেবল ভয় না, বিদ্বেষও যেন মিশে আছে। গাছ ভয় পেল, দেখল, কেবল দিনের আলোয় না রাত্রির গভীর অন্ধকারেও দুটি চোখ জানলায় জেগে আছে। নিরাকার অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি হয়ে রাত্রির গাঢ় তমসায় লুকিয়ে থেকেও যেন গাছ ওই দৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারছে না। আতঙ্কের সঙ্গে পুঞ্জ পুঞ্জ ঘৃণা ছুড়ে দিচ্ছে একজন তার দিকে।

তারপর কথাটা জানাজানি হয়ে গেল। বুঝি সবুজ জানলার ওই মানুষটি সকলকে জানিয়ে দিল।

এই গাছ দুষ্ট। এই গাছ শয়তান। একে এখান থেকে সরিয়ে দাও।

পড়ো জমির আশপাশের মানুষগুলি সজাগ হয়ে উঠল।

মানুষের মতো শয়তান হয়ে একটা গাছ মানুষের মধ্যে মিশে থাকতে পারে

তারা এই প্রথম শুনল, জানল।

তাই তো, সকলে ভাবতে আরম্ভ করল, বুড়োর দল গাছের নীচে বসে পলিটিক্স আলোচনা করে, বুড়িরা যুবতিদের সঙ্গে বসে ছেলে হওয়া না হওয়ার গল্প করে, ছেলে-ছোকরার দল গাছের কাছে এসে খেলা করে; এমন গাছটা যদি ভালো না হয় যদি তার মধ্যে দুস্ট বুদ্ধি লুকিয়ে থাকে তবে তো—কেটে ফেলতে হবে, পুড়িয়ে দিতে হবে, মূলসুদ্ধ উপড়ে ফেললে সবচেয়ে ভালো হয়। সাদা ফুলের জড়ানো স্ফীত শক্ত খোঁপা নেড়ে জানালার মানুষটি বলল, তা না হলে এ গাছ কখন কী বিপদ ঘটায় বলা যায় না।

সবাই শুনল, সবাই জানল।

শিশুরা খেলা করে। এই গাছে একটা বড়ো ডাল তাদের মাথায় ভেঙে পড়তে কতক্ষণ। বজ্রপাত হতে পারে এই গাছের মাথায়। আর নীচে তখন যে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে তার অবধারিত মৃত্যু। অর্থাৎ গাছই বজ্রকে ডেকে আনে। শয়তান কী না পারে। শুনে মানুষের চোখ বড়ো হয়ে গেল।

কিন্তু সেই সবুজ জানলার মানুষটি চুপ করে থাকল না। গাছ সম্বন্ধে এতকাল যারা উদাসীন ছিল তারা আরও ভয়ংকর কথা শুনল।

কেবল বজ্র কেন, শয়তান মধ্যরাত্রে যে-কোনো একটি মানুষকে ডেকে নিজের কাছে আনতে পারে।

হুঁ, সকালে উঠে সবাই দেখবে সেই মানুষ ওই গাছের কোনো না কোনো একটা ডালে ঝুলছে।

গলায় দড়ি দেবার পথে গাছের ডাল যে একটি চমৎকার অবলম্বন, কথাটা নতুন করে সকলের মনে পড়ে গেল।

ওই গাছ পুড়িয়ে ফেলতে হবে, কেটে ফেলতে হবে, সম্ভব হলে মূলসুদ্ধ।

হয়তো গাছের জানা ছিল না, পড়ো জমির পশ্চিমদিকের আর একটা বাড়ির লাল রঙের জানালায় বসে আর- একজন তাকে গভীরভাবে দেখছিল। সেদিকে দৃষ্টি পড়তে গাছ চমকে উঠল এবং খুশি হল। লাল রঙের জানলার মানুষটির চোখ দুটি বড়ো সুন্দর। সেই চোখে ভয় আতঙ্ক ঘৃণা বিদ্বেষ কিছুই নেই। আছে স্নেহ প্রেম মমতা সহানুভূতি। দেখে গাছ বিস্মিত হল। কেন-না, কয়দিন আগেও মানুষটির দৃষ্টি অশান্ত ছিল, চলায় বলায় চাপল্য ছিল। হাফ প্যান্ট পরে সময়ে অসময়ে তার কাছে ছুটে এসেছে, ঢিল ছুড়েছে ডাল-পাতা লক্ষ করে, পাতার আড়ালে পাখির

বাসা খুঁজে বার করে ভেঙে দিয়েছে, আর যখন তখন দোলনা বেঁধে দোল খেয়েছে। আজ সেই মার্জিত ভদ্র স্নিগ্ধ সুন্দর। আদ্দির পাঞ্জাবির হাত দুটো কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে দু-হাতের তোলোয় চিবুক রেখে জানলার ধারের টেবিলের কাছে বসে গাছের দিকে গাঢ় দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। ভাবতে ভাবতে টেবিলের ফুলদানি থেকে একটা গোলাপ নাকের কাছে তুলে গন্ধ শোঁকে, যেন গাছটাকে যত দেখছে যত ভাবছে তত সে পরিতৃপ্ত হচ্ছে, আনন্দিত হচ্ছে। যেন গাছকে নিয়ে ভাবনার সঙ্গে গোলাপের গন্ধের একটা আশ্চর্য মিল রয়েছে। বুঝি গাছ তার কাছে গোলাপের মতো সুন্দর।

গাছ নিশ্চিন্ত হল, আশ্বস্ত হল। লাল জানালার মানুষটার মুখে সবাই অন্য কথা শুনল।

এই গাছ ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই গাছের নীচে সকালে বিকালে মানুষগুলি একত্র হয়। একটি মানুষকে আর-একটি মানুষের মনের কাছে টেনে আনছে গাছটা। তার অর্থ আমাদের সামাজিক হতে শেখাচ্ছে। গাছটা আছে বলে ছেলেরা খেলাধুলা করতে পারে। মায়ের মতো শিশুদের স্নেহ ও আনন্দ বিতরণ করছে মাঠের ওই বনস্পতি।

সত্যি সে সুন্দর।

তার ছায়া সুন্দর, ডাল সুন্দর। তাই না নিরীহ সুন্দর পাখিগুলি তাকে আশ্রয় করে সারাক্ষণ কূজনগুঞ্জন করছে। প্রজাপতি ছুটে আসছে।

পাড়ার মানুষগুলি নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করল।

পশ্চিমের লাল জানলার সুন্দর মানুষটি সেইখানেই চুপ করে থাকল না।

ইট, লোহা, সিমেন্টের মধ্যে বাস করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের চোখের সামনে একটি সবুজ গাছ আছে বলে প্রকৃতিকে আমরা মনে রাখতে পারছি। আমরা যে এখনও পুরোপুরি কৃত্রিম হয়ে যাইনি তা ওই গাছের কল্যাণে। এই গাছ থাকবে। এই গাছ আমাদের ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত জীবনে একটা কবিতার মতো।

তবে কি লাল জানলার মানুষটি কবি? গাছ ভাবল। রাত্রে জানলার ধারে টেবিলে বসে মানুষটি কাগজ-কলম নিয়ে কী যেন লেখে, যখন লেখে না চুপ করে বাইরে গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মন্দ কথা শুনে মানুষ যেমন বিচলিত হয় তেমনি ভালো কথা শুনে তারা নিশ্চিন্ত হয়, খুশি হয়।

তাই একজন গাছটাকে মন্দ বলতে মানুষগুলি যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, আবার আর-একজন গাছ তাদের অনেক উপকার করছে শুনে শান্ত হল।

তাই তারা গাছ নিয়ে আর মাথা ঘামাল না।

গাছের মনে গাছ দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু পুবের জানলার মানুষটি চুপ থাকল না। গাছ শুনল, দাঁতে দাঁত ঘসে যে প্রতিজ্ঞা করছে, যদি আর কেউ তাকে সাহায্য না করে তো সে নিজেই কুড়ুল চালিয়ে গাছটাকে শেষ করে দেবে। এই গাছ সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না শয়তানকে চোখের সামনে থেকে যেভাবে হোক দূর করবে।

গাছ শুনে দুঃখ পেলে, আবার মনে মনে হাসল। যেন পুবের জানলার মানুষটিকে তার ডেকে বলতে ইচ্ছে হল, তোমার খোঁপায় ফুলের মালা শোভা পায়, তোমার চোখের কাজল, কপালের কুমকুমটি চমৎকার, তোমার হাতের আঙুলগুলি চাঁপার কলির মতো সুন্দর! সুন্দর ও নরম, এই হাতে কুড়ুল ধরতে পারবে কি?

যেন পশ্চিমের জানালার মানুষটির কানেও কথাটা গেল। তার সুন্দর আঙুলগুলি কঠিন হয়ে উঠল। গাছের বেশ জানা আছে ওই হাত, হাতের আঙুল দরকার হলে ইস্পাতের মতো দৃঢ় দৃপ্ত হতে জানে। আজ ওই দিয়ে সে কবিতা লিখছে বটে, গোলাপফুলকে আদর করছে—একদিন এ হাতে ঢিল ছুড়ে সে অনেক পাখির বাসা তছনছ করে দিয়েছে, গাছের ডাল ভেঙেছে, পাতা ছিঁড়েছে আর রুদ্রের মতো হাতের দুটো মুঠো কঠিন করে দোলনার দড়ি আঁকড়ে ধরে দানবশিশুর মতো দোল খেয়েছে। তাই বুঝি আজ বজ্রমুষ্টি শূন্যে তুলে সে প্রতিজ্ঞা করল, এই গাছকে যেমন করে হোক রক্ষা করবে। যদি কেউ এই গাছ নষ্ট করতে আসে তাকে ক্ষমা করবে না। জীবন থেকে কবিতাকে নির্বাসন দেওয়া চলে না। যদি কেউ গাছের গায়ে হাত তুলতে আসে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সে তাকে প্রতিহত করবে। গাছের গায়ে আঁচড়টি পড়তে দেবে না।

গাছ নতুন করে ভয় পেল! তাকে কেন্দ্র করে পুব ও পশ্চিমের জানলার দুটি মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধবে না তো!

সেদিন দুপুর গড়িয়ে গেল। দুটো বাচ্চা নিয়ে একটা ছাগল নীচের ছায়ায় ঘুরে ঘুরে ঘাস খেল। বিকেল পড়তে শিশুর দল হুটোপুটি করল। অগুন্তি পাখি কিচিরমিচির করে উঠে তারপর এক সময় চুপ হয়ে গেল। রাত্রি নামল। নির্মেঘ কালো আকাশে অসংখ্য তারা ফুটল। হাওয়া ছিল। গাছের পাতায় সর-সর শব্দ হচ্ছিল। রোজ

যেমন হয়। পড়ো মাঠের চারপাশের বাড়িগুলেতে নানা রকম শব্দ হচ্ছিল, আলো জ্বলছিল। ক্রমে রাত যত বাড়তে লাগল এক-একটি বাড়ি চুপ হয়ে যেতে লাগল, আলো নিভল। তারপর চারদিক নিঃসীম অন্ধকারে ছেয়ে গেল। অন্ধকার আর অমেয় স্তব্ধতা। মাথার ওপর কোটি-কোটি নক্ষত্র নিয়ে গাছ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় হাওয়াটাও মরে গেল। গাছের একটি পাতাও আর নড়ছিল না।

এমন সময়।

নিরন্ধ্র অন্ধকারে দিনের আলোর মতো গাছ সব কিছু দেখতে পায়। গাছ দেখল পুবদিক থেকে সে আসছে। আঁচলটা শক্ত করে কোমরে বেঁধেছে। মালাটা খোঁপা থেকে খুলে ফেলে দিয়েছে। যেন যুদ্ধ করতে আসছে। এখন আর ফুলের মালা নয়। হাতে ধারালো কুঠার। গাছ শিউরে উঠল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর-একদিকে মানুষের পায়ের শব্দ হল। গাছ সেদিকে চোখ ফেরাল। এবার গাছ নিশ্চিন্ত হল। সে এসে গেছে। পশ্চিমের জানালার সেই মানুষ এসে গেছে। তার হাতে এখন কলম নেই। একটা লাঠি। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি নেই। হাতকাটা গেঞ্জি। তার চোয়াল শক্ত। দৃষ্টি নির্মম। যেন এখনি সে বজ্রের হুংকার ছাড়বে।

গাছ কান পেতে রইল।

বিষন্ন স্তব্ধতা। অনিশ্চিত মুহূর্ত।

গাছের মাথায় একটা পাখির ছানা কিচমিচ শব্দ করে উঠল। যেন কোন্‌দিক থেকে একটা নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ ভেসে এল। আকাশের এক প্রান্তের একটা তারার কাছে ছুটে গেল। একটু হাওয়া উঠল বই-কি। নরম শাখাগুলি দুলতে লাগল।

যেন ভিতরে ভিতরে গাছ এমনটা আশা করেছিল। তাই খুব একটা অবাক হল না।

শাড়ি-জড়ানো মানুষটির অধরে হাসি ফুটেছে।

পশ্চিমের জানলার মানুষের শক্ত চোয়াল নরম হয়েছে। বজ্রনির্ঘোষ শোনা যাচ্ছে না।

একজন আর-একজনের দিকে তাকিয়ে আছে। দুজনের মাঝখানের ব্যবধান এত কম যে গাঢ় অন্ধকারেও তারা পরস্পরের মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। যেন একজন আর-একজনের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনছিল।

"হাতে কুড়ুল কেন?"

"গাছটাকে কাটব।"

"লাভ কী?"

"গাছটা শয়তান।"

"গাছটা দেবতা।"

"শয়তানকে যে দেবতা মনে করে সে মূর্খ।"

"দেবতাকে যে শয়তানের মতো দেখে সে পাপী। তার মনে পাপ, তার হৃদয়ে হিংসা। তাই সাদাকে কালো দেখে—আলো থাকলেও তার চোখে সবকিছু অন্ধকার।"

"তবে কি পৃথিবীতে অন্ধকার বলতে কিছু নেই? কালো বলতে কিছু নেই?

"নেই।"

"এ কেমন করে সম্ভব।" হাত থেকে কুড়ুলটা খসে পড়ল ওর। ভাবতে লাগল। গাছ খুশি হল। গাছ দেখল একজন কুড়ুল ফেলে দিল, আর-একজন হাতের লাঠি ফেলে দিল। "এ কেমন করে হয়।" ভাবতে ভাবতে পুবের জানালার মানুষটি মুখ তুলে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে তারার ঝিকিমিকি দেখতে লাগল। তারপর এক সময় বিড়বিড় করে বলল, "সব আলো সব সুন্দর—কিছু কালো নেই, কোথাও অন্ধকার নেই,—এমন কখনও হয়?"

" নিজের ভিতরে যখন আলো জাগে।"

"সেই আলো কী?"

"প্রেম।"

মেয়েটির চোখের পাতা কেঁপে উঠল। গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। তার গলার স্বর করুণ হয়ে গেল।

"আমার মধ্যে কি প্রেম জাগবে না?"

"অভ্যাস করতে হবে, চর্চা করতে হবে।" ছেলেটি সুন্দর করে হাসল। "ভালোবাসতে শিখতে হবে।"

"তুমি আমায় শিখিয়ে দাও।"

গাছ চোখ বুজল। তার ঘুম পেয়েছে। গাছও ঘুমায়। কত রাত দুশ্চিন্তায় সে ঘুমোতে পারেনি। অথবা যেন ইচ্ছা করে সে আর নীচের দিকে তাকাল না। মানুষ যেমন গাছ সম্পর্কে উদাসীন থাকে, গাছকেও সময় সময় মানুষ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে হয়, অভিজ্ঞ গাছকে তা বলে দিতে হল না।

আগরতলার ইতিবৃত্ত

রমাপ্রসাদ দত্ত

ছায়া ঘেরা ঘু ঘু ডাকা রাঙা মাটির দেশে, মোরামে মোড়া পথের বাঁকে দামাল ছেলেরা বাঁশি বাজাতে বাজাতে চলে যেত মেঠো পথ ধরে, কারমাইকেল ব্রিজ পার হয়ে বিশালগড়ের দিকে কিংবা চার রাস্তার মোড়ে বিশাল বটগাছের নিবিড় ছায়ায় বসে, চারদিকের ছোটো ছোটো ডোবার জলে ব্যাঙের লাফালাফি জটলা করে বসে দেখত যে ছেলেরা, তারা আজ কোথায়? সে দৃশ্য আজ কোথায়?

কাঁচা রাস্তায় লাল মাটির ধুলো উড়িয়ে গোরুর গাড়ি যেত। গাড়ির চালকের মুখে গান। চাকার ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দে মুখর থাকত চলার পথ। সন্ধ্যাবেলা শেয়ালের ডাক, ঝোপে ঝাড়ে জোনাকির জ্বলা-নেভা আলো, হাতির ভয়ে বাঘের ডাকে রাতের ঘুম আতঙ্ক, তারই মাঝে ঝিঁঝি পোকার ডাকে থেকে থেকে চোখে নেমে আসত তন্দ্রা। সে দিনগুলি কি হারিয়ে গেল। সে আগরতলা আজ কোথায়? সে কি হারিয়ে গেল!

রামনগরে 'ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে'র পাশেই পূর্ণ যৌবনা কাটাখাল, কখনও বা রুদ্রমূর্তি কখনও বা শান্ত। ওপারেতে মেঘে ঢাকা গ্রামখানিতে খেজুর তাল আম কাঁঠালের সমারোহ, গ্রামের নাম অভয়নগর । লোকের বসতবাটী কম, বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে কবরখানা। কোথায় সে দৃশ্য? আগরতলা কি তবে হারিয়ে গেল?

"ছোটো নদী হাওড়া, দেখতে ক্ষীণকায়া" নাড়ির টান পাহাড়ের সঙ্গে, বর্ষায় জল নামে, ছোটো নদী স্ফীত হয়, গ্রাম ডোবায়। অপরদিকে শস্য খেত উর্বর করে। সামনে উঁচু-নীচু টিলা। টিলার নীচে বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে বক, দোয়েল, বটকল

পাখির বিচরণ ক্ষেত্র, শিকারিদের লোভনীয় স্থান। নাম বড়দোয়ালি।

শরৎ এসেছে মায়ের বার্তা নিয়ে। ঘরে ঘরে আনন্দ, বাড়ি বাড়ি শেফালির গন্ধ। রাতের শেষে ঘাসের পরে শিশির ভেজা ফুল কুড়ানোর ধূম, প্রবাসীর ঘরেফেরা রাঙাবউ-এর সারা বছরের প্রতীক্ষার অবসান। শিশুর মুখে হাসি, পূজার দিনে বাঁশি, বাজনা, দর্শনার্থীর ভিড় সবই যেন একই সুরে বাঁধা ছিল সেদিন।

সংগীত আর ফুল, এ দুটির সমারোহ আগরতলার বৈশিষ্ট্য। সেদিন পথেঘাটে দেখা যেত পাহাড়ি মেয়ে আর রাজবংশের সুন্দরীদের। যাদের হাতে ফুলের কাঁকন, গলায় ফুলের মালা, কানে ফুলের দুল আর খোঁপায় রজনিগন্ধা বা গোলাপ গোঁজা। বাড়ির অঙ্গানে ফুলের বাগান, পথের ধারে শিমুল ফুলের গাছ। রং বেরঙের নাম জানা না জানা কত ফুল।

সংগীত—বহু ঘরানার সমাবেশ ঘটেছে এখানে। দেশ-বিদেশ থেকে এসেছে সংগীতের ওস্তাদেরা, পেয়েছেন রাজসম্মান। সংগীতপিপাসু জনসাধারণ তাঁদেরকে নিয়েছে আপন করে। সংগীতের চর্চা করেছে যার যার ঘরানার মাধ্যমে। পথে যেতে যেতে সেতারের ঝংকার, সরোদের সুমিষ্ট তান, তবলার লহরি মনকে নিয়ে গেছে এক আনন্দময় জগতে।

সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতির কাঁসরঘণ্টা আর মসজিদের আজান, প্রার্থনা সংগীত আর কোরানের সুর মিশে গেছে একাকার হয়ে। মন্দিরে মন্দিরে আরতি, মসজিদে মসজিদে আজানের সুর, লাল ফেজটুপি পরা মৌলবি আর গলায় পইতে, মাথায় টিকি, পূজারি ব্রাহ্মণ। মুখে তাদের ভক্তির ব্যঞ্জনা, সমাজে ছিল তাদের উচ্চমান। স্বল্প লোক সংখ্যার আগরতলা সেদিন তাদের আপন করে নিয়েছিল।

"রাঙাধূলি ব্রজের পথে" সবার মুখে মুখে হোলির গান। হোলি উৎসব ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান উৎসব। রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে আবির গোলা বড়ো বড়ো চৌবাচ্চা, যে যায় তাকে চৌবাচ্চাতে ফেলে দেয়, লাল হয়ে উঠে আসে। রাতে ফাগুন পূর্ণিমায় হোলির দল ফাগ ছড়াতে ছড়াতে গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি যেত, আর রঙে রঙে রাঙাত সবাইকে। ছেলে বুড়ো যুবক যুবতি সবাই মেতে উঠত হোলি খেলায়।

পাঁচ পাড়ার শহর আগরতলা। ছোট্ট শহর অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ড্রেনের

আবর্জনা, গাড়ির অহেতুক গর্জন, চলার পথে যানবাহনের ভয়াবহতা, কোনোটাই ছিল না। পাঁচ পাড়া আজ বহু পাড়ায় বিভক্ত।

শিবনগরের বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে মহিষের বিচরণ। জগহরিমুড়ায় হাতির খেদা, তারই পার্শ্ববর্তী ঝোপেঝাড়ে হরিণ, খরগোসের খেয়ালি নৃত্য আজ শুধু কল্পনা আর অতীতের রোমন্থন। দূরে স্বপ্নের কলেজ, অসমাপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে অহল্যার তপস্যায় রত, চারিদিকে তার বনগয়ামের সমারোহ, পথিক থমকে দাঁড়িয়ে কোঁচড় ভরে নিয়ে যাচ্ছে। আর চেয়ে দেখছে অদূরে ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠছে ম্যাচ ফ্যাক্টরির কারখানা থেকে।

চালের মন তেরো-চোদ্দো টাকা। নিজের খেতের ভাত, নিজের গাভির দুধ, নিজের পুকুরের মাছ, রবিশস্যে ভরা ঘর, স্বচ্ছল জীবন, সহজ চলাফেরা, সরল হাসি এই নিয়ে ছিল আগরতলাবাসীর জীবন। জাতিবর্ণে আন্তরিকতা, সুখে-দুখে সহযোগিতা, স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠত সংহতি।

কৃষ্ণমাণিক্যের আমলে আগরতলায় ত্রিপুরার রাজধানী স্থাপিত হয়। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আগরতলা বর্তমান পুরাতন আগরতলা এবং মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের প্রতিষ্ঠিত আগরতলা নতুন হাউলি বা হাভেলি বলে পরিচিত।

কৃষ্ণকিশোর প্রতিষ্ঠিত আগরতলার রূপ সেদিন কীরূপ ছিল? ছিল গভীর অরণ্য। বাস করত বাঘ হাতি শূকর প্রভৃতি জন্তু। আর ছিল অগুরু গাছের বন। সে সময় সে স্থানের নাম ছিল ছাইদ্রা। ছাইদ্রা শব্দের অর্থ হল হাওড়া। ছাইদ্রা নামের সমাপ্তি ঘটিয়ে কৃষ্ণকিশোর কৃষ্ণমাণিক্যের দেওয়া (পুরাতন) আগরতলা নামের সাথে নাম মিলিয়ে নাম রাখলেন আগরতলা। ইতিহাসে ছাইদ্রা নামের উল্লেখ পাওয়া যাবে না। কিছু জনশ্রুতি এ নামের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

সেদিনের আগরতলায় ছিল না কোনো অট্টালিকা, ছিল না মোরাম মোড়া রাজপথ। বাঁশ বেত ছন তিনের সমন্বয়ে গড়ে উঠল আটচালা ঘর। সে আটচালাই সেদিনের রাজপ্রাসাদ। তারই মধ্যে বাস করতেন রাজা কৃষ্ণকিশোর। সে সময় আগরতলার লোকসংখ্যা ছিল ৮৭৫ জন। কৃষ্ণকিশোরের মৃত্যুর তারিখটি ছিল ত্রিপুরাব্দ ১২৫৯ সনের ২ বৈশাখ। এরপর ঈশানচন্দ্র মাণিক্য রাজ্যভার গ্রহণ

করলেন। অভিষেকের তারিখটি ছিল ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি। ইংরেজ সরকারকে নজরানা দিয়েছিলেন ১১১টি স্বর্ণমুদ্রা।

সে সময় আগরতলায় একটি বিদ্যালয় ছিল। বিদ্যালয়ের নাম ছিল 'নূতন হাবেলি বঙ্গাবিদ্যালয়'। সমস্ত ত্রিপুরায় ছিল মাত্র দুটি স্কুল। সরকারি দলিল থেকে সে সম্পর্কে জানা যায়।

১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে নতুন হাবেলি বঙ্গাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল বাহাত্তর জন। রাজার আত্মীয়স্বজন এবং সম্পর্কিত পরিবারের ছেলে তেত্রিশ জন, বাঙালি কুড়িজন, মণিপুরি আট জন, হিন্দুস্থানি আটজন এবং মুসলমান তিনজন। সে সময় বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন চারজন। দুইজন ইংরেজির, একজন বাংলার ও একজন সংস্কৃতের। ১৮৭২-৭৩ খ্রিষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ের জন্য সরকারি সাহায্য ছিল তিনশত সত্তর টাকা। ১৮৭৩-৭৪ খ্রিষ্টাব্দে সরকারি সাহায্য বাড়িয়ে করা হয়েছিল ১৩৬০ টাকা এবং সে সময় ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রকে আর্থিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা ছিল।

(সংক্ষেপিত)

আদিবাসী ত্রিপুরি সমাজের পূজা উৎসব

বিজয়কুমার দেববর্মন

ভারতের উত্ত-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত ছোটো পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরা। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ছোটো এই রাজ্যের এক বৃহৎ অংশকে তিনদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এতদ্ব্যতীত ত্রিপুরা একদিকে অসম এবং অপরদিকে মিজোরামের সাথে সামাজিক এবং ভৌগোলিকভাবে সংযুক্ত। রাজ্যের আদিম অধিবাসী হিসাবে ত্রিপুরি, রিয়াং, জমাতিয়া, কুকি, হালাম প্রভৃতি উনিশটি জাতি বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে এই ত্রিপুরায় সেই আদিকাল থেকেই। এই আদিম জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ত্রিপুরি সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রতিটি আদিম জাতি তথা উপজাতি গোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও ত্রিপুরা বিশ্ব-সংস্কৃতির এক মহান পীঠভূমি। নানা উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজ নিজ ভাষা প্রচলিত রয়েছে। ত্রিপুরি সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা 'ককবরক' নামে পরিচিত। ভারতবর্ষের অতি প্রচীন রাজ্য হিসাবে ত্রিপুরা নামের পরিচয় বা উল্লেখ পাওয়া যায় সেই মহাভারতের যুগ থেকে। একদা বহু শক্তিধর সামন্ত প্রধান কর্তৃক এই রাজ্য শাসিত হয়েছিল। সেই আদিমকাল থেকেই রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসীই উলুখড়, ছন প্রভৃতি দ্বারা ছাওয়া চালাঘরে বসবাস করে আসছে এবং আজও সেই ধারা চলমান। এইসব চালাকুটির বা ঘরসমূহের আঞ্চলিক নাম 'টংগর' এবং এগুলি সাধারণত অরণ্যাবৃত উঁচু টিলা-পাহাড়ে অবস্থিত। কেউ কেউ আবার সমতল জায়গায়ও বসবাস করে থাকে। এটা অতি গৌরবের বিষয় যে ভাষা এবং সংস্কৃতির দিক থেকে বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই রাজ্যে বসবাসকারী সকল সম্প্রদায়ের লোক জাতি, ধর্মনির্বিশেষে পরস্পর শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে আসছে। আদিকাল থেকেই এই রাজ্যের বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার্চনা সামাজিকভাবে প্রচলিত রয়েছে। বিশেষ করে ত্রিপুরি সম্প্রদায় গভীর বিশ্বাস ও ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে তাদের উপাস্য নানা দেবদেবীর আরাধনা করে থাকে।

ত্রিপুরি সমাজে নানাবিধ দেবদেবী পূজাসমূহের মধ্য সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল ভগবান গড়িয়া দেবতার পূজা। গড়িয়াপূজা হল ত্রিপুরি জাতির খুশির উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষ্যে সকলেই নববস্ত্র পরিধান করে। শহরাঞ্চলেও ত্রিপুরি পরিবারের মধ্যে গড়িয়াপূজা ও উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। এই সমাজে পৌরাণিক দেবতা 'গণেশ' গড়িয়া নামে পরিচিত। গড়িয়াপূজা ও উৎসব প্রতি বছর চৈত্র মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ, চৈত্রসংক্রান্তির দিন থেকে শুরু হয়ে থাকে।

ভগবান 'গড়িয়া'কে বাঁশের সাহায্যে রূপ দেওয়া হয়। পুজোর দিন প্রত্যুষে গড়িয়া দেবতার প্রতীকস্বরূপ পত্রসমেত একটি সবুজ বাঁশ বাড়ির সম্মুখ প্রাঙ্গণে মাটি খুঁড়ে স্থাপিত করা হয়। ত্রিপুরি সমাজ গড়িয়া দেবতার প্রতীক এই বিশেষ বাঁশটিকে 'গড়িয়া ওয়াচক' নামে আখ্যা দিয়ে থাকে। বাঁশটির পত্রশাখায় ফুলের মালা এবং কার্পাস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর বাঁশটিকে লাল ও সাদা সুতোয় বোনা একটি নতুন কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখা হয়। লাল-সাদা সুতোয় বয়ন করা এই কাপড়টি ত্রিপুরি সমাজে 'পাছড়া' বলে পরিচিত। 'পাছড়া' হল এক জাতীয় কাপড় যা ত্রিপুরি মহিলারা শাড়ি বা অঙ্গাবসনরূপে পরিধান করে। গড়িয়া দেবতার প্রতীক মূর্তি বাঁশের প্রতিকৃতিটির সম্মুখভাগে একটি কলাপাতা রাখা হয় এবং এই কদলীপত্রের উপস্থাপনের মাধ্যমে ভগবান গড়িয়ার উপস্থিতি সম্যক বোঝানো হয়। এই কদলীপত্রের উপরই দেবতাকে উৎসর্গস্বরূপ হাঁস, মোরগ প্রভৃতি বলি দেওয়ার রীতি। ভগবান গড়িয়াকে একবার যে জায়গায় সংস্থাপিত করা হয় সেই নির্দিষ্ট স্থান থেকে সপ্ত দিবস পর্যন্ত এই প্রতীক বিগ্রহকে অন্য কোথাও স্থানান্তর করা যায় না। বৈশাখ মাসের সপ্তম দিবসে গড়িয়াপূজা বা উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। ওইদিন অন্তিম নৈবেদ্য উৎসর্গপূর্বক গড়িয়া দেবতাকে বিদায় জানানো হয়। ত্রিপুরিদের মধ্যে এই বিশ্বাস বা মতবাদ প্রচলিত রয়েছে যে ওইদিন ভগবান গড়িয়া গ্রাম বা পাড়া ত্যাগ করে চলে যান। ত্রিপুরি সমাজের কোনো কোনো পরিবার গড়িয়া দেবতার পূজা চৈত্রসংক্রান্তির বদলে বৈশাখ মাসের সপ্তম দিবসে উদ্‌যাপন করে থাকে। গড়িয়া দেবতাকে আসনচ্যুত করার অনতিপূর্বে বা প্রাক্‌মুহূর্তে গৃহকর্তার তরফ থেকে একটি মোরগ বলিদানপূর্বক উৎসর্গীকৃত ওই মোরগের রক্ত দিয়ে ভগবান গড়িয়ার চরণ ধুইয়ে দেওয়া হয়। ওই সময় প্রধান পূজারি অচাই কর্তৃক পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের নামে বা পক্ষ থেকে দেবতাকে একটি করে ডিম্ব উৎসর্গ করা হয়ে

থাকে এবং এই প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত হয়ে আসছে। পূজা সমাপন হওয়ার পর ভগবান গড়িয়ার প্রতীক মূর্তিটিকে হয় জলে বিসর্জন দেওয়া হয় নতুবা বাড়ির পশ্চৎদেশে নির্জন ছায়া ঘেরা জায়গায় সংস্থাপনপূর্বক রক্ষিত করা হয়। গড়িয়াপূজা উপলক্ষ্যে টানা সপ্ত দিবস এই উৎসব চলাকালীন সময়ে এই রাজ্যের ত্রিপুরি সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মিলে নাচ-গানসহকারে আমোদ উল্লাসে মত্ত হয়ে অফুরন্ত আনন্দ উপভোগ করে থাকে এবং যুবক-যুবতিরা প্রত্যেকে নৃত্যগীত ও কথামালার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে পরস্পর বাক্-বিনিময় করে থাকে। প্রতিবেশী রাজ্য অসমের সর্বাধিক জনপ্রিয় উৎসব 'বিহু'র সাথে ত্রিপুরার গড়িয়াপূজার আনন্দ-উৎসবের একটা সাযুজ্য রয়েছে। সেখানেও বিহু উৎসবের সময়ে নাচ-গানের মাধ্যমে যুবক-যুবতিদের মধ্যে মত বা বাক্য বিনিময় হয়ে থাকে।

ধান্য বা শস্য সংগ্রহের পর অধিকাংশ ত্রিপুরি পরিবারই জুমচাষের জমিতে 'মাইলুমা' ও 'খুলুমা' দেবীদ্বয়ের পূজা সম্পন্ন করে এবং তিন থেকে পাঁচ বৎসর সময়ের জন্য সেই জমি পতিত করে রাখে। এই পূজা চেংলাইপূজা নামে পরিচিত। এই পূজার উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্য বা প্রসাদ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় না।

ত্রিপুরি সমাজের অন্য আর-একটি পূজাপার্বণের নাম 'কের' উৎসব। এই কের পূজা উৎসব শুধুমাত্র রাজধানীতেই নয় ত্রিপুরার অতি প্রত্যন্ত পার্বত্য গ্রামাঞ্চলেও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পার্বত্য অঞ্চলে কেরপূজা সাধারণত কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। 'কের' হল রক্ষা বা বন্ধন। গ্রাম বা পাড়া বা অঞ্চলের সমস্ত অদিবাসী তথা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের নিরাপত্তা এবং সর্বাঙ্গীণ মঙ্গাল কামনায় এই 'কের' পূজা করা হয়ে থাকে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই পূজার সমূহ আয়োজন করে গ্রাম বা পাড়া অথবা অঞ্চলের সর্দারিগণ। পূজার যাবতীয় খরচ মেটানো হয় ওই গ্রাম বা পাড়া বা অঞ্চলের প্রতিটি পরিবারের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত দানসামগ্রী বা চাঁদার দ্বারা। এই উৎসব শুরু হওয়ার দিন দুই আগে থেকে পূজার প্রধান পুরোহিত এবং তাঁর সহকারীদিগকে তাম্বুল এবং সুপারি প্রদানপূর্বক পূজার কার্য সমাধা করার জন্য এবং কের উৎসবে যোগদানের জন্য বিপুল সমাদরে ও শ্রদ্ধা সহকারে আমন্ত্রণ জানানো হয়। উৎসবের দিন প্রত্যুষে 'কের' পূজা শুরু করার পূর্বে 'লাম্প্রা' দেবতার পূজা সম্পাদন করা হয়ে থাকে। যে-কোনো শুভ কাজ বা উৎসব বা পূজা শুরু করার পূর্বে 'লাম্প্রা'পূজা করা বধ্যতামূলক। এমনকি বিবাহ বা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেও

লাম্প্রাদেবতার পূজা করা হয়ে থাকে এবং বিধি অনুযায়ী এটা জরুরি এবং আবশ্যিক। আটটি ছোটো সরু বাঁশের কঞ্চি দিয়ে 'লাম্প্রা' দেবতার প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়। 'লাম্প্রা' দেবতার আকৃতি তথা রূপ দানের সময় চারটি বাঁশের কঞ্চিকে আড়াআড়ি সমান্তরালভাবে রাখা হয় এবং অন্য বাকি চারটিকে স্বল্প ব্যবধানে উল্লম্বভাবে রাখা হয়। বাঁশের তৈরি ছোটো ছোটো খোপ বা কুঠুরিবিশিষ্ঠ আয়তক্ষেত্রাকার 'লাম্প্রা' দেবতার প্রতিকৃতিসূচক কাঠামো বা গড়নটি অনেকটা লাতিন 'ক্রশ'-এর মতো দেখায়। প্রথা অনুযায়ী 'লাম্প্রা'পূজা বাড়ির বাইরে সাধারণত রাস্তার চৌমাথায় তথা চারটি পথের সংযোগ বা মিলন স্থলে সম্পন্ন কারা হয়ে থাকে। 'লাম্প্রা' পূজা সম্পাদনের পর পূজার পবিত্র বারি বা শান্তিজল গ্রাম বা পাড়া বা অঞ্চলের চতুর্দিকে ছিটিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। পর দিবস প্রভাতে আচারপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবী কালীমাতাকে স্মরণ করে কালীপূজা সম্পাদনপূর্বক 'কের' পূজা শুরু হয়।

'কের'পূজার অপর এক অঙ্গ গঙ্গাপূজা সাধনের জন্য একটি ছাগপশু এবং একটি মোরগ দেবী গঙ্গার প্রতীক নদীতে বা নদীর তীরে বলিদানপূর্বক উৎসর্গ করা হয়। ত্রিপুরি সমাজে এই পূজা 'তুইমা' বা 'গঙ্গাপূজা' নামে পরিচিত। গঙ্গাপূজার পর একটি কালো মোরগ উৎসর্গ বা বলিদানের মাধ্যমে 'বুড়াছা' বা 'বনদেবতার' পূজা করা হয়। তারপর 'মৃত্যুদূত' বলে অভিহিত 'থুমনাইরগ' এবং 'বণিরক' নামে দুই দেবতার উদ্দেশ্যে দুটি মোরগ বলি দেওয়া হয়ে থাকে। সায়ংকালে 'নাকড়ি' নামে পরিচিত সুন্দর কারুকার্যভূষিত 'কের'-এর প্রতীক দুটি বাঁশ গ্রামের দুটি প্রান্তে সংস্থাপন করা হয়। পূজার পার্থিব উপাদান বা উপকরণ স্বরূপ 'থারুকমা' নামে অভিহিত আর-একটি ছোটো বাঁশের খন্ড 'কের' দেবতার প্রতীক পূর্বোক্ত বাঁশ দুটির উদ্দেশ্যে রক্ষিত থাকে। এই পূজা অনুষ্ঠানের জন্য একজোড়া হাঁস বলি দেওয়ার প্রথা রয়েছে। এই 'কের' পূজার্চনা বা আরাধনা সকালবেলা থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যাবেলায় শেষ হয়ে থাকে। 'কের'পূজার প্রায়োগিক নিয়মবিধি এবং ধর্মীয় আচারনিষ্ঠা অনুসারে প্রতিটি করণীয় পূজা পর পর আলাদাভাবে সম্পন্ন করা হয়। কেরপূজা চলাকালীন সময়ে বহিরাগত কোনো ব্যক্তিকে গ্রাম বা পাড়া বা অঞ্চলের সীমানার মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বহিরাগত কেউ যেন গ্রাম বা পাড়া বা অঞ্চলের এলাকা বা সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে সেইজন্য গ্রাম বা পাড়া বা

অঞ্চলের বাইরে বা বহিঃসীমানায় সতর্কতাসূচক চিহ্ন বা সংকেত দেওয়া থাকে। গ্রাম বা পাড়া বা অঞ্চলের নিরাপত্তা এবং সকল অধিবাসীবৃন্দের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ বা মঙ্গালের জন্য 'কের'পূজা করা হয়। এই কেরপূজা সেই আদিকাল থেকেই এই রাজ্যে ত্রিপুরার চন্দ্রবংশসম্ভূত রাজকুল কর্তৃক চিরাচরিত বিধি অনুযায়ী পরম নিষ্ঠাসহকারে প্রতিপালিত হয়ে আসছে। ত্রিপুরার রাজকুল কর্তৃক এই কেরপূজা সাধারণত 'খার্চি'পূজার পর সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ত্রিপুরি লোকসম্প্রদায় প্রতি বছর পৌষ বা মাঘ মাসে 'তুইমা'পূজা বা গঙ্গাপূজা করে থাকে। 'তুইমা' বা গঙ্গাপূজা উৎসবের যাবতীয় সরঞ্জাম ও খরচপত্রাদি গ্রামবাসীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়পূর্বক সংগ্রহ করা হয়। বাঁশের তৈরি অনিন্দ্যসুন্দর অলংকরণে পরম্পরাগত স্থানীয় সুনিপুণ ত্রিপুরি শিল্পধারায় রকমারি সুচারু সুললিত নকশাখচিত অপূর্ব শৈল্পিক রচনাশৈলী ও কলাসৌষ্ঠবে সুসজ্জিত কারুকার্যময় দেবীর প্রতীক প্রতিকৃতি ও কাঠামো নদীর তীরবর্তী নির্বাচিত স্থলে পূজার্চনার জন্য সংস্থাপন করা হয়। বেশ ছাগপশু ও মোরগ বলিদানপূর্বক উৎসর্গস্বরূপ এই 'তুইমা' বা গঙ্গাপূজায় দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়ে থাকে। আবহমানকাল থেকে আজও এই রাজ্যের সরল প্রাণ উপজাতি সমাজের মধ্যে পরম নিষ্ঠাসহকারে প্রতি বৎসর 'তুইমা' বা গঙ্গাপূজা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়ে আসছে।

খার্চিপূজা হল ত্রিপুরিদের এক অতি জনপ্রিয় উৎসব। প্রতি বছর আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমী তিথি থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে সপ্ত দিবস ধরে এই পূজা চলে। সপ্তাহকালব্যাপী এই খার্চি পূজা উৎসবকে ত্রিপুরিদের 'জাতীয় উৎসব' বলে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এই পূজার প্রধান পুরোহিতকে 'চন্তাই' এবং অন্যান্যদের 'দেওয়াই' বলা হয়। খার্চি হল ধরিত্রী তথা পৃথিবীর পূজা। খার্চিপূজার শুরু থেকে সপ্তাহকাল চোদ্দোটি বিভিন্ন দেবদেবীর যেমন— (১) হর, (২) উমা, (৩) হরি, (৪) লক্ষ্মী, (৫) বাণী, (৬) কার্তিকেয়, (৭) গণেশ, (৮) ব্রহ্মা, (৯) পৃথ্বী, (১০) সমুদ্র, (১১) গঙ্গা, (১২) অগ্নি, (১৩) কামদেব ও (১৪) হিমাদ্রি একত্রে সমবেতভাবে অর্চিত বা পূজিত হয়ে থাকে। এই চতুর্দশ দেবতা পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা রাজাদের 'কুলদেবতা' বলে পরিচিত। এবম্বিদ বিভিন্ন চতুর্দশ দেবতাবৃন্দের মধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবকেই সবার উর্দ্ধে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই সকল দেবদেবীর

কোনো পূর্ণ অবয়ব বা মূর্তি নেই। চতুর্দশ দেবদেবী প্রত্যেককে কেবল মুখাবয়ব বা প্রতীক মুখে রূপদানপূর্বক স্ব-স্ব মূর্তি বা বিগ্রহে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেবলমাত্র দেবাদিদেব শিবের প্রতীক মুখ রূপটি রজতমন্ডিত। অন্যসকল দেবদেবীর প্রতীক মুখসমূহ ব্রোঞ্জ তথা কাংস্য ধাতু দ্বারা নির্মিত। ভগবান বিষ্ণু এবং কুলদেবী লক্ষ্মী সাথে দেবাদিদেব শিবের প্রতীক রজতমুন্ডটি নিত্য অর্চিত হয়ে থাকে। অন্য বাদ বাকি-এগারোটি প্রতীক মুখ খার্চি পূজা উৎসব সমাপনের পর সযত্নে নির্ধারিত কক্ষে তুলে রাখা হয়। পুনরায় বৎসরান্তে আষাঢ়ী শুক্লাষ্টমী তিথিতে নিত্য অর্চিত তিনটি প্রতীক মুন্ডসহ চতুর্দশ দেবদেবীর প্রতীক মুন্ডসমূহ খার্চিপূজা শুরুর দিন সকালে নদীর জলে অবগাহন করিয়ে চতুর্দশ দেবদেবীকে একত্রে পূজার্চনার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত পাটে পর পর সারিবদ্ধ ভাবে সংস্থাপন করা হয়। খার্চিপূজা চলাকালে প্রতিদিন ছাগপশু ও কবুতর বলিদানপূর্বক চতুর্দশ দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গস্বরূপ নিবেদন করা হয়। পূর্বে এই পূজা ত্রিপুরা রাজ্যের তদানীন্তন রাজধানী রাঙামাটিতে (বর্তমান উদয়পুর) অনুষ্ঠিত হত। পরবর্তী সময়ে রাজধানী স্থানান্তরের কারণে এই চতুর্দশ দেবতা বিগ্রহ উদয়পুর থেকে পুরাতন হাবেলি তথা পুরাতন আগরতলার বর্তমান মন্দিরে এই বিগ্রহের পূজা হয়ে আসছে। এই চতুর্দশ দেবতাবৃন্দের প্রতিটি প্রতীক দেবদেবীর মস্তকদেশ 'অর্ধচন্দ্রকলা' লাঞ্ছন দ্বারা শোভিত। এর সঠিক কারণ অজ্ঞাত। খুব সম্ভবত ত্রিপুরা রাজ্যের নৃপতিকুল চন্দ্রবংশভূত বলে তাঁদের কুলদেবতা প্রতিটি দেবদেবীর মস্তকদেশ 'অর্ধচন্দ্রকলা' লাঞ্ছন দ্বারা ভূষিত করেছেন। হিন্দু তথা ভারতীয় দেবদেবীবৃন্দের মধ্যে একমাত্র দেবাদিদেব শিব ও তৎজায়া দেবী পার্বতীর মস্তকদেশে 'অর্ধচন্দ্রকলা' বিরাজিত দেখা যায়। অন্য সকল দেবদেবীর মস্তকদেশে অনুরূপ 'অর্ধচন্দ্রকলা' চিহ্ন সচরাচর দৃষ্ট হয় না। ত্রিপুরার কুলদেবতা চতুর্দশ দেবতার ন্যায় মস্তকদেশে শোভিত অর্ধচন্দ্রকলাকৃতি রূপ প্রাচীন সুমেরীয়দের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। (সংক্ষেপিত)

ইচ্ছাপূরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুবলচন্দ্রের ছেলেটির নাম সুশীলচন্দ্র। কিন্তু সকল সময়ে নামের মতো মানুষটি হয় না। সেই জন্যই সুবলচন্দ্র কিছু দুর্বল ছিলেন এবং সুশীলচন্দ্র বড়ো শান্ত ছিলেন না।

ছেলেটি পাড়াশুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া বেড়াইত, সেই জন্যই বাপ মাঝে মাঝে শাসন করিতে ছুটিতেন; কিন্তু বাপের পায়ে ছিল বাত, আর ছেলেটি হরিণের মতো দৌড়িতে পারিত; কাজেই কিল, চড়, চাপড় সকল সময় ঠিক জায়গায় পড়িত না। কিন্তু সুশীলচন্দ্র দৈবাৎ যেদিন ধরা পরিতেন, সেদিন তাহার আর রক্ষা থাকিত না।

আজ শনিবারের দিনে দুটোর সময় স্কুলের ছুটি ছিল, কিন্তু আজ স্কুলে যাইতে সুশীলের কিছুতেই মন উঠতেছিল না। তাহার অনেকগুলো কারণ ছিল। একে তো আজ স্কুলে ভূগোলের পরীক্ষা, তাহাতে আবার ও-পাড়ার বোসেদের বাড়ি আজ সন্ধ্যার সময় বাজি পোড়ানো হইবে। সকাল হইতে সেখানে ধুমধাম চলিতেছে। সুশীলের ইচ্ছা, সেখানেই আজ দিনটা কাটাইয়া দেয়।

অনেক ভাবিয়া, শেষকালে স্কুলে যাইবার সময় বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার বাপ সুবল গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে বিছানায় পড়ে আছিস যে। আজ স্কুলে যাবিনে?"

সুশীল বলিল, "আমার পেট কামড়াচ্ছে, আজ আমি স্কুল যেতে পারব না।"

সুবল তাহার মিথ্যা কথা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বলিলেন, রোস,

একে আজ জব্দ করতে হবে। এই বলিয়া কহিলেন, "পেট কামড়াচ্ছে? তবে আর তো কোথাও গিয়ে কাজ নেই। বোসেদের বাড়ি বাজি দেখতে হরিকে একলাই পাঠিয়ে দেব এখন। তোর জন্যে আজ লজেনচুষ কিনে রেখেছিলুম সেও আজ খেয়ে কাজ নেই। তুই এখানে চুপ করে পড়ে থাক্, আমি খানিকটা পাঁচন তৈরি করে নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া তাহার ঘরে শিকল দিয়া সুবলচন্দ্র খুব তিতো পাঁচন তৈয়ার করিয়া আনিতে গেলেন। সুশীল মহা মুশকিলে পড়িয়া গেল। লজেনচুষ সে যেমন ভালোবাসিত, পাঁচন খাইতে হইলে তাহার তেমনি সর্বনাশ বোধ হইত। ওদিকে আবার বোসেদের বাড়ি যাইবার জন্য কাল রাত হইতে তাহার মন ছটফট করিতেছে, তাহাও বুঝি বন্ধ হইল।

সুবলবাবু যখন খুব বড়ো এক বাটি পাঁচন লইয়া ঘরে ঢুকিলেন, সুশীল বিছানা হইতে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল, "আমার পেট কামড়ানো একেবারে সেরে গেছে, আমি আজ স্কুলে যাব।"

বাবা বলিলেন, "না না, সে কাজ নেই, তুই পাঁচন খেয়ে এইখানে চুপচাপ করে শুয়ে থাক্।" এই বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া পাঁচন খাওয়াইয়া ঘরে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সুশীল বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত দিন ধরিয়া কেবল মনে করিতে লাগিল, আহা, যদি কালই আমার বাবার মতো বয়স হয়, আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি, আমাকে কেউ বন্ধ করে রাখতে পারে না।

তাহার বাপ সুবলবাবু বাহিরে একলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার বাপ-মা আমাকে বড়ো বেশি আদর দিতেন বলেই তো আমার ভালো রকম পড়াশোনা কিছু হল না। আহা, আবার যদি সেই ছেলেবেলা ফিরে পাই, তাহলে আর কিছুতেই সময় নষ্ট না করে কেবল পড়াশোনা করেনি।

ইচ্ছাঠাকরুন সেই সময় ঘরের বাহির দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বাপের ও ছেলের মনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, আচ্ছা ভালো, কিছুদিন ইহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াই দেখা যাক।

এই ভাবিয়া বাপকে গিয়া বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কাল হইতে তুমি তোমার ছেলের বয়স পাইবে।" ছেলেকে গিয়া বলিলেন, "কাল হইতে তুমি তোমার বাপের বয়সি হইবে।" শুনিয়া দুইজনে ভারী খুশি হইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ সুবলচন্দ্র রাত্রে ভালো ঘুমাইতে পারিতেন না, ভোরের দিকটায় ঘুমাইতেন। কিন্তু আজ তাঁহার কী হইল, হঠাৎ খুব ভোরে উঠিয়া একেবারে লাফ দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন খুব ছোটো হইয়া গেছেন; পড়া দাঁত সবগুলি উঠিয়াছে; মুখের গোঁফ দাড়ি সমস্ত কোথায় গেছে, তাহার আর চিহ্ন নাই। রাত্রে যে ধুতি জামা পরিয়া শুইয়াছিলেন, সকালবেলায় তাহা এত ঢিলা হইয়া গেছে যে, হাতের দুই আস্তিন প্রায় মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, জামার গলা বুক পর্যন্ত নাবিয়াছে, ধুতির কোঁচাটা এতই লুটাইতেছে যে, পা ফেলিয়া চলাই দায়।

আমাদের সুশীলচন্দ্র অন্যদিন ভোরে উঠিয়া চারিদিকে দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ান, কিন্তু আজ তাহার ঘুম আর ভাঙে না; যখন তাহার বাপ সুবলচন্দ্রের চেঁচামেচিতে সে জাগিয়া উঠিল, তখন দেখিল, কাপড়চোপড়গুলো গায়ে এমনি আঁটিয়া গেছে যে ছিঁড়িয়া ফাটিয়া কুটি কুটি হইবার জো হইয়াছে; শরীরটা সমস্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে; কাঁচা পাকা গোঁফ-দাড়িতে অর্ধেকটা মুখ দেখাই যায় না; মাথায় এক মাথা চুল ছিল। হাত দিয়া দেখে, সামনে চুল নাই—পরিষ্কার টাক, তক্‌তক্ করিতেছে।

আজ সকালে সুশীলচন্দ্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেই চায় না। অনেকবার তুড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাই তুলিল; অনেকবার এপাশ ওপাশ করিল; শেষকালে সুবলচন্দ্রের গোলমালে ভারী বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

দুইজনের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু ভারী মুশকিল বাধিয়া গেল। আগেই বলিয়াছি, সুশীলচন্দ্র মনে করিত যে, সে যদি তাহার বাবা সুবলচন্দ্রের মতো বড়ো এবং স্বাধীন হয়, তবে যেমন ইচ্ছা গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপ দিয়ে, কাঁচা আম খাইয়া, পাখির বাচ্চা পাড়িয়া দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবে; যখন ইচ্ছা ঘরে আসিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইবে, কেহ বারণ করিবার থাকিবে না। কিন্তু আশ্চর্য এই, সেদিন সকালে উঠিয়া তাহার গাছে চড়িতে ইচ্ছাই হইল না। পানা পুকুরটা দেখিয়া তাহার মনে হইল, ইহাতে ঝাঁপ দিলেই আমার কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিবে। চুপচাপ করিয়া দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

একবার মনে হইল, খেলাধুলাগুলো একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়াটা ভালো হয় না, একবার চেষ্টা করিয়াই দেখা যাক। এই ভাবিয়া কাছে একটা আমড়া গাছ ছিল, সেইটাতে উঠিবার জন্য অনেক রকম চেষ্টা করিল। কাল যে গাছটাতে কাঠবিড়ালির মতো তর তর করিয়া চড়িতে পারিত, আজ বুড়া শরীর লইয়া সে গাছে কিছুতেই উঠিতে পারিল না; নীচেকার একটা কচি ডাল ধরিবামাত্র সেটা তাহার শরীরের ভারে ভাঙিয়া গেল এবং বুড়া সুশীল ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কাছে রাস্তা দিয়া লোক চলিতেছিল, তাহারা বুড়াকে ছেলেমানুষের মতো গাছে চড়িতে ও পড়িতে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। সুশীলচন্দ্র লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া আবার সেই দাওয়ায় মাদুরে আসিয়া বসিল। চাকরকে বলিল, "ওরে বাজার থেকে একটাকার লজেনচুষ কিনে আন্।"

লজেনচুষের প্রতি সুশীলচন্দ্রের বড়ো লোভ ছিল। স্কুলের ধারে দোকানে সে রোজ নানা রঙের লজেনচুষ কিনিয়া খাইত; মনে করিত, যখন বাবার মতো টাকা হইবে, তখন কেবল পকেট ভরিয়া ভরিয়া লজেনচুষ কিনিবে এবং খাইবে। আজ চাকর এক টাকায় এক রাশ লজেনচুষ কিনিয়া আনিয়া দিল; তাহারই একটা লইয়া সে দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিয়া চুষিতে লাগিল; কিন্তু বুড়ার মুখে ছেলেমানুষের লজেনচুষ কিছুতেই ভালো লাগিল না। একবার ভাবিল, এগুলা আমার ছেলেমানুষ বাবাকে খাইতে দেওয়া যাক আবার তখনই মনে হইল না, কাজ নাই, এত লজেনচুষ খাইলে উহার আবার অসুখ করিবে।

কাল পর্যন্ত যে সকল ছেলে সুশীলচন্দ্রের সঙ্গে কপাটি খেলিয়াছে, আজ তাহারা সুশীলের সন্ধানে আসিয়া বুড়া সুশীলকে দেখিয়া দূরে ছুটিয়া গেল।

সুশীল ভাবিয়াছিল, বাপের মতো স্বাধীন হইলে তাহার সমস্ত ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে সমস্তদিন ধরিয়া কেবলই ডুডু ডুডু শব্দে কপাটি খেলিয়া বেড়াইবে; কিন্তু আজ রাখাল, গোপাল, অক্ষয়, নিবারণ, হরিশ এবং নন্দকে দেখিয়া মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল; ভাবিল চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি, এমনি বুঝি ছোঁড়াগুলো গোলমাল বাধাইয়া দিবে।

আগেই বলিয়াছি, বাবা সুবলচন্দ্র প্রতিদিন দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া ভাবিতেন, যখন ছোটো ছিলাম তখন দুষ্টামি করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, ছেলে

বয়স ফিরিয়া পাইলে সমস্ত দিন শান্তশিষ্ট হইয়া, ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া কেবলই বই লইয়া পড়া মুখস্থ করি। এমনকি, সন্ধ্যার পরে ঠাকুরমার কাছে গল্প শোনাও বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রি দশটা-এগারোটা পর্যন্ত পড়া তৈয়ারি করি।

কিন্তু ছেলে বয়স ফিরিয়া পাইয়া সুবলচন্দ্র কিছুতেই স্কুলমুখো হইতে চাহেন না। সুশীল বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিত, "বাবা, ইস্কুলে যাবে না?" সুবল মাথা চুলকাইয়া মুখ নীচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিতেন, "আজ আমার পেট কামড়াচ্ছে, আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।" সুশীল রাগ করিয়া বলিত, "পারবে না বই-কি! ইস্কুলে যাবার সময় আমারও অমন ঢের পেট কামড়েছে, আমি ও সব জানি।"

বাস্তবিক সুশীল এত রকম উপায়ে স্কুল পলাইত এবং সে এত অল্পদিনের কথা যে, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া তাহার বাপের কর্ম নহে। সুশীল জোর করিয়া ক্ষুদ্র বাপটিকে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। স্কুলের ছুটির পরে সুবল বাড়ি আসিয়া খুব একচোট ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন; কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে বৃদ্ধ সুশীলচন্দ্র চোখে চশমা দিয়া একখানি কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়া সুর করিয়া পড়িত, সুবলের ছুটাছুটি গোলমালে তাহার পড়ায় ব্যাঘাত হইত। তাই সে জোর করিয়া সুবলকে ধরিয়া সম্মুখে বসাইয়া হাতে একখানা স্লেট দিয়া আঁক কষিতে দিত। আঁকগুলো এমনি বড়ো বড়ো বাছিয়া দিত যে, তাহার একটা কষিতেই তাহার বাপের এক ঘণ্টা চলিয়া যাইত। সন্ধ্যাবেলায় বুড়া সুশীলের ঘরে অনেক বুড়ায় মিলিয়া দাবা খেলিত। সে সময়টায় সুবলকে ঠান্ডা রাখিবার জন্য সুশীল একজন মাস্টার রাখিয়া দিল, মাস্টার রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাহাকে পড়াইত।

খাওয়ার বিষয়ে সুশীলের বড়ো কড়াকড়ি ছিল। কারণ, তাহার বাপ সুবল যখন বৃদ্ধ ছিলেন, তখন তাহার খাওয়া ভালো হজম হইত না, একটু বেশি খাইলেই অম্বল হইত,—সুশীলের সে কথাটা বেশ মনে আছে, সেজন্য সে তাহার বাপকে কিছুতেই অধিক খাইতে দিত না। কিন্তু হঠাৎ অল্প বয়স হইয়া আজকাল তাঁহার এমনি ক্ষুধা হইয়াছে যে, নুড়ি হজম করিয়া ফেলিতে পারিতেন। সুশীল তাঁহাকে যতই অল্প খাইতে দিত, পেটের জ্বালায় তিনি ততই অস্থির হইয়া বেড়াইতেন। শেষকালে রোগা হইয়া শুকাইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গের হাড় বাহির হইয়া পড়িল। সুশীল ভাবিল, শক্ত ব্যামো হইয়াছে ; তাই কেবল ঔষধ গিলাইতে লাগল। বুড়া সুশীলের

বড়ো গোল বাধিল। সে তাহার পূর্বকালের অভ্যাস মতো যাহা করে, তাহাই তাহার সহ্য হয় না। পূর্বে সে পাড়ায় কোথাও যাত্রাগানের খবর পাইলেই, বাড়ি হইতে পলাইয়া, হিমে হোক, বৃষ্টিতে হোক, সেখানে গিয়া হাজির হইত। আজিকার বুড়া সুশীল সেই কাজ করিতে গিয়া—সর্দি হইয়া—কাশি হইয়া, গায়ে মাথায় ব্যথা হইয়া—তিন হপ্তা শয্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিল। চিরকাল সে পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়াছে, আজও তাহা করিতে গিয়া হাতের গাঁট, পায়ের গাঁট ফুলিয়া বিষম বাত উপস্থিত হইল; তাহার চিকিৎসা করিতে ছয় মাস গেল। তাহার পর হইতে দুই দিন অন্তর সে গরম জলে স্নান করিত এবং সুবলকেও কিছুতেই পুকুরে স্নান করিতে দিত না। পূর্বেকার অভ্যাস মতো, ভুলিয়া তপ্তপোষ হইতে লাফ দিয়া নামিতে যায়, আর হাড়গুলো টনটন ঝড়ঝড় করিয়া উঠে। মুখের মধ্যে আস্ত পান পুরিয়াই হঠাৎ দেখে, দাঁত নাই, পান চিবানো অসাধ্য। ভুলিয়া চিরুনি, ব্রুশ লইয়া মাথা আঁচড়াইতে গিয়া দেখে, প্রায় সকল মাথাতেই টাক। এক-একদিন হঠাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে তাহার বাপের বয়সি বুড়া হইয়াছে এবং পূর্বের অভ্যাস মতো দুস্টামি করিয়া ঢিল ছুড়িয়া মারিত—বুড়া মানুষের এই ছেলেমানুষি দুস্টামি দেখিয়া, লোকেরা তাহাকে মার্ মার্ করিয়া তাড়াইয়া দিত, সেও লজ্জায় মুখ রাখিবার জায়গা পাইত না।

সুবলচন্দ্র এক-একদিন দৈবাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে আজকাল ছেলেমানুষ হইয়াছে। আপনাকে পূর্বের মতো বুড়া মনে করিয়া, যেখানে বুড়া মানুষেরা তাস, পাশা খেলিতেছে, সেইখানে গিয়া সে বসিত এবং বুড়ার মতো কথা বলিত, শুনিয়া সকলেই তাহাকে "যা যা, খেলা কর্‌গে যা, জ্যাঠামি করতে হবে না",—বলিয়া কান ধরিয়া বিদায় করিয়া দিত। হঠাৎ ভুলিয়া মাস্টারকে গিয়া বলিত, "দাও তো তামাকটা দাও তো, খেয়ে নিই।" শুনিয়া মাস্টার তাহাকে বেঞ্চের উপর একপায়ে দাঁড় করাইয়া দিত। নাপিতকে গিয়া বলিত, "ওরে ফেজা, কদিন আমাকে কামাতে আসিসনি কেন।"

নাপিত ভাবিত, ছেলেটি খুব ঠাট্টা করিতে শিখিয়াছে। সে উত্তর দিত, "আর বছর দশেক বাদে আসব অখন!" আবার এক-একদিন তাহার পূর্বের অভ্যাস মতো তাহার ছেলে সুশীলকে গিয়া মারিত।

সুশীল ভারী রাগ করিয়া বলিত—"পড়াশুনো করে তোমার এই বুদ্ধি হচ্ছে? একরত্তি ছেলে হয়ে বুড়ো মানুষের গায়ে হাত তোলো।"—অমনি চারিদিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া, কেহ কিল, কেহ চড়, কেহ গালি দিতে আরম্ভ করে।

তখন সুবল একান্ত মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, "আহা, যদি আমি আমার ছেলে সুশীলের মতো বুড়া হই এবং স্বাধীন হই, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই।"

সুশীল প্রতিদিন জোড় হাত করিয়া বলে, "হে দেবতা, আমার বাপের মতো আমাকে ছোটো করিয়া দাও, মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াই। বাবা যে রকম দুষ্টামি আরম্ভ করিয়াছেন, উহাকে আর আমি সামলাইতে পারি না, সর্বদা ভাবিয়া অস্থির হইলাম।"

তখন ইচ্ছাঠাকরুন আসিয়া বলিলেন, "কেমন তোমাদের শখ মিটিয়াছে?" তাঁহারা দুজনে গড় হইয়া প্রণাম করিলেন,—"দোহাই ঠাকরুন মিটিয়াছে। এখন আমরা যে যাহা ছিলাম আমাদিগকে তাহাই করিয়া দাও।"

ইচ্ছাঠাকরুন বলিলেন—"আচ্ছা, কাল সকালে উঠিয়া তাহাই হইবে।"

পরদিন সকালে সুবল পূর্বের মতো বুড়া হইয়া এবং সুশীল ছেলে হইয়া জাগিয়া উঠিলেন, দুই জনেরই মনে হইল যে স্বপ্ন হইতে জাগিয়াছে। সুবল গলা ভার করিয়া বলিলেন,— "সুশীল ব্যাকরণ মুখস্থ করবে না?"

সুশীল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "বাবা আমার বই হারিয়ে গেছে।"

মাস্টারমহাশয়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বে বর্ধমান শহর হইতে ষোলো ক্রোশ দূরে, দামোদর নদের অপর পারে, নন্দীপুর ও গোঁসাইগঞ্জ নামক পাশাপাশি দুইটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল; এবং উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর একটি প্রাচীন সুবৃহৎ বটবৃক্ষ দন্ডায়মান ছিল। এখন সে গ্রাম দুখানিও নাই, বটবৃক্ষটিও অদৃশ্য। দামোদরের বন্যা সে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

ফাল্গুন মাস; এক প্রহর বেলা হইয়াছে। গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর প্রজা এবং গ্রামের অভিভাবক স্থানীয় কায়স্থ সন্তান শ্রীযুক্ত হীরালাল দাস দত্ত মহাশয় হুঁকা হাতে করিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। প্রতিবেশী শ্যামাপদ মুখুজ্জে ও কেনারাম মল্লিক (ইঁহারাও বড়ো প্রজা) নিকটে বসিয়া, এ বৎসর চৈত্রমাসে বরোয়ারি অন্নপূর্ণা পূজা কীরূপভাবে নির্বাহ করিতে হইবে, তাহারই পরামর্শ করিতেছিলেন। পার্শ্ববর্তী নন্দীগ্রামেও প্রতি বৎসর চাঁদা করিয়া ধূমধামের সহিত অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া থাকে। এ বৎসর গুজব শুনা যাইতেছে, উহারা অন্যান্য বৎসরের মতো যাত্রা তো আনিবেই অধিকন্তু কলিকাতায় কোনো ঢপওয়ালিকেও বায়না দিয়া আসিয়াছে। ঢপ সংগীত এ অঞ্চলে ইতিপূর্বে কখনও শোনা যায় নাই। এ গুজব যদি সত্য হয়, তবে গোঁসাইগঞ্জেরও শুধু যাত্রা আনিলে চলিবে না, ঢপ আনিতে হইবে। উহারা কোন্ ঢপওয়ালিকে বায়না দিয়াছে, সেই গোপন সংবাদটুকু সংগ্রহ করিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার নামটি 'সঠিক' জানিতে পারিলে, বর্ধমানে অথবা কলিকাতায় গিয়া খবর লইতে হইবে সেই ঢপওয়ালি অপেক্ষা কোন্ ঢপওয়ালি সমধিক খ্যাতিসম্পন্না, এবং সেই বিখ্যাত ঢপওয়ালিকে গাওনা করিবার বায়না দিতে হইবে—ইহাতে যত টাকা লাগে লাগুক। কারণ গোঁসাইগঞ্জবাসীগণের এক বাক্যে ইহাই মত যে , তিনপুরুষ ধরিয়া গোঁসাইগঞ্জ কোনো বিষয়ে নন্দীপুরের নিকট হটে নাই—এবং আজিও হটিবে না।

আগামী বারোয়ারি পূজা সম্বন্ধে যখন গ্রামস্থ তিনজন প্রধান ব্যক্তির মধ্যে উল্লিখিত প্রকার গভীর ও গূঢ় আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় রামচরণ মন্ডল হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল এবং হাতের লাঠিটা আছড়াইয়া ফেলিয়া ধপাস করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া হীরু দত্ত সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হে মোড়লের পো, অমন করে বসে পড়লে কেন? কী হয়েছে?"

রামচরণ দুইচক্ষু কপালে তুলিয়া হাঁপাইতে হ্যাঁপাইতে বলিল, "কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করছেন দত্তজা, কী হতে আর বাকি আছে? হায় হায় হায়—কার্তিক মাসে যখন আমার জ্বর বিকার হয়েছিল, তখনই আমি গেলাম না কেন? এই দেখবার জন্যে কি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিলি হার রে বিধেতা, তোর পোড়া কপাল!"

শ্যামাপদ ও কেনারামও ঘোর দুশ্চিন্তায় রামচরণের পানে চাহিয়া রহিলেন। দত্তজা বলিলেন, "কী হয়েছে, কী হয়েছে? সব কথা খুলে বলো। এখন আসছ কোথা থেকে?"

দীর্ঘশ্বাসজড়িত স্বরে রামচরণ উত্তর করিল, "নন্দীপুর থেকে। হায় হায় শেষকালে নন্দীপুরের কাছে মাথা হেঁট হয়ে গেল। হা রে কপাল?" বলিয়া রামচরণ সজোরে নিজ ললাটে করাঘাত করিল।

দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কেন? নন্দীপুরওয়ালারা কী করেছে?"

"বলছি। বলবার জন্যেই এসেছি। এই রোদ্দুরে মশাই, এক ক্রোশ পথ ছুটতে ছুটতে এসেছি। গলাটা শুকিয়ে গেছে, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। এক ঘটি জল—"

দত্তজার আদেশে অবিলম্বে এক ঘড়া জল ও একটি ঘটি আসিল। রামচরণ উঠিয়া রোয়াকের প্রান্তে বসিয়া, সেই জলে হাত পা মুখ ধুইয়া ফেলিল; কিঞ্চিৎ পানও করিল। তারপর হাত মুখ মুছিতে মুছিতে নিকটে আসিয়া বসিয়া, গভীর বিষাদে মাথাটি ঝুঁকাইয়া রাখিল।

হীরু দত্ত বলিলেন, "এবার বলো কী হয়েছে, আর দগ্ধে মেরো না বাপু।"

রামচরণ বলিল, "কী হয়েছে? যা হবার নয় তাই হয়েছে। বড়ো বড়ো শহরে যা হয় না, নন্দীপুরে তাই হয়েছে। এসব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনও যা স্বপ্নে ভাবেনি, তাই হয়েছে। তারা হুস্কুল বসিয়েছে।"

তিনজনেই সমবেত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, " সে কী আবার? হুস্কুল কী?"

রামচরণ বলিল, "আরে ছাই, আমিই কি জানতাম আগে হুস্কুল কার নাম? আজ না

শুনলাম ! ইঞ্জিরি পড়ার পাঠশালাকে হুস্কুল বলে।"

দত্তজা বললেন, "ওঃ — ইস্কুল খুলেছে বুঝি ?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ— তাই খুলেছে। একজন ম্যাস্টর নিয়ে এসেছে। ইঞ্জিরি পাঠশালের গুরুমশায়কে নাকি ম্যাস্টর বলে। দাশুঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে হুস্কুল বসেছে। স্বচক্ষে দেখে এলাম ম্যাষ্টর বসে দশ-বারোজন ছেলেকে ইঞ্জিরি পড়াচ্ছে।"

হীরু দত্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাস্টার কোথা থেকে এসেছে তা কিছু শুনলে ?"

"সব খবরই নিয়ে এসেছি। বর্ধমান থেকে এনেছে। বামুনের ছেলে—হারান চক্রবর্তী। পনেরো টাকা মাইনে, বাসা, খোরাক। সব খবরই নিয়ে এসেছি।"

বাহিরে এই সময়ে একটা কোলাহল শোনা গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল, পিল পিল করিয়া লোক সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। রামচরণ পথে আসিতে আসিতে নন্দীপুরের হস্তে গোঁসাইগঞ্জের এই অভূতপূর্ব পরাভব সংবাদ প্রচার করিয়া আসিয়াছিল। সকলে আসিয়া চিৎকার করিয়া নানাছন্দে বলিতে লাগিল, "এ কী সর্বনাশ হল ! নন্দীপুরের হাতে এই অপমান ? আমাদের ইস্কুল খোলবার এখন কী উপায় হবে ?" হীরু দত্ত সেই রোয়াকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—

"ভাই সকল ! তোমরা কি মনে করেছ। তিনপুরুষ পরে আজ গোঁসাইগঞ্জ নন্দীপুরের কাছে হটে যাবে ? কখনই না। এ দেহে প্রাণ থাকতে নয়। আমরাও ইস্কুল খুলব। ওরা বা কী ইস্কুল খুলেছে, আমরা তার চতুর্গুণ ভালো ইস্কুল খুলব। তোমরা শান্ত হয়ে ঘরে যাও। আজই খাওয়া দাওয়া করে আমি বেরুচ্ছি। কলকাতা যাবার রেল খুলেছে, আর তো কোনো ভাবনা নেই। আমি কলকাতায় গিয়ে ওদের চেয়ে ভালো মাস্টার নিয়ে আসব। ওরা ১৫ টাকা দিয়ে মাস্টার এনেছে ? আমরা ২৫ টাকা মাইনে দেব। ওদের মাস্টারকে পড়াতে পারে এমন মাস্টার আমি নিয়ে আসব। আজ থেকে এক হপ্তার মধ্যে, আমার এই চণ্ডীমণ্ডপে ইস্কুল বসাব বসাব বসাব—তিনসত্যি করলাম। এখন যাও তোমরা বাড়ি যাও, স্নানাহার করো গে।"

"জয় গোঁসাইগঞ্জের জয়। জয় হীরু দত্তের জয়।" সোল্লাসে চিৎকার করিতে করিতে তখন সেই জনতা প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতা হইতে মাস্টার নিযুক্ত করিয়া হীরু দত্ত চতুর্থ দিবসে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

মাস্টারমহাশয়ের নাম ব্রজগোপাল মিত্র। বয়স ত্রিশ বৎসর, খর্বাকার, কৃশকায় ব্যক্তি, বড়ো মিষ্টভাষী। ইংরেজি বলিতে কহিতে লিখিতে পড়িতে নাকি ভারী ওস্তাদ। ইংরেজিটা তাঁর এতই বেশি অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে মাঝে মাঝে ইংরেজি কথা মিশাইয়া ফেলেন—অজ্ঞ লোকের সুবিধার্থে আবার তাহা বাংলা করিয়া বুঝাইয়াও দেন। বলেন, পূর্বে পিতার জীবিতকালে, একদিন কলিকাতার গঙ্গার ধারে মাস্টারমহাশয় না কি বেড়াইতে ছিলেন, তথায় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। সাহেব তাঁহার ইংরেজি শুনিয়া, লাটসাহেবের নিকট সে গল্প করিয়াছিলেন। লাটসাহেব মাস্টারমহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইয়া, ডেপুটি কালেক্টারি পদ তাঁহাকে দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তখন তিনি বাপের বেটা, সংসারের চিন্তা ছিল না, সেই প্রস্তাব তিনি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আজ অভাবে পড়িয়া এই ২৫টাকার চাকরি তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল। পুরুষস্য ভাগ্যং।—মাস্টারমহাশয়ের মুখে এইরূপ কথাবার্তা শুনিয়া এবং তাহার ইংরেজিয়ানা চালচলন দেখিয়া গ্রামের লোক একেবারে মোহিত হইয়া গেল।

হীরু দত্তের প্রতিজ্ঞা অনুসারে পরদিনই ইস্কুল খুলিল। পনেরো-ষোলোটি ছাত্র লইয়া মাস্টারমহাশয় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। কলিকাতা হইতে (দত্তজার ব্যয়ে) তিনি প্রচুর পরিমাণে সেলেট, পেন্সিল ও মরে সাহেবের স্পেলিং-বুক পুস্তক খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন। ছাত্রগণের উৎসাহ বর্ধনার্থ সেগুলি তাহাদিগকে বিনামূল্যেই দেওয়া হইতে লাগিল।

গোঁসাইগঞ্জের লোকের সঙ্গে নন্দীপুরের লোকের পথেঘাটে দেখা হইলে, উভয় গ্রামের মাস্টার সম্বন্ধে আলোচনা হইত। গোঁসাইগঞ্জ বলিত—"বর্ধমানের মাস্টার, ও জানেই বা কী, আর পড়াবেই বা কী।" নন্দীপুর বলিত—"হলেই বা আমাদের মাস্টারের বর্ধমানে বাড়ি, তিনিও তো কলকাতাতেই লেখাপড়া শিখেছেন। ওঁরা যখন পড়তেন, তখন কি বর্ধমানে ইংরেজি ইস্কুল ছিল? কলকাতায় গিয়ে ইংরিজি পড়তে হত।"

যথাসময়ে উভয় গ্রামের বারোয়ারি পূজার উৎসব আরম্ভ হইল। উভয় গ্রামেই উভয় গ্রামের লোকদিগকে প্রতিমা দর্শন, প্রসাদ ভক্ষণ, যাত্রা ও ঢপসংগীত শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিল। এই উপলক্ষ্যে উভয় মাস্টারের দেখা সাক্ষাৎ হইয়া গেল এবং সভাস্থলে প্রকাশ পাইল, উভয়ে পূর্বাবিধি পরিচিত।

পূজান্তে গোঁসাইগঞ্জ একটা কথা শুনিয়া বড়োই উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিল। নন্দীপুরের মাস্টার নাকি বলিয়াছেন—"ওই বেজা বুঝি ওদের মাস্টার হয়ে এসেছে, তা অ্যাদ্দিন জানতাম না। ওটা তো মহামূর্খ। ছেলেবেলায় কলকাতায় আমরা এক ক্লাসে পড়তাম কিনা। আমরা যখন সেকেনবুক পড়ি, সেই সময়ে ও ইস্কুল ছেড়ে দেয়। তারপর আর তো ও ইংরেজি পড়েনি। বড়োবাজাড়ে এক মহাজনের আড়তে খাতা লিখত, মাইনে ছিল সাত টাকা। গেল বছরও তো কলকাতায় ওর সঙ্গে দেখা হয়; তখনও তো ওই চাকরি করেছে।" গোঁসাইগঞ্জবাসীরা ব্রজ মাস্টারকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কী শুনছি?"

ব্রজ মাস্টার একথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "একেই বলে কলিকাল। সেকেনবুক পড়ার সময় আমি ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছিলাম, না ওই ছেড়ে দিয়েছিল? হয়েছিল কী জানো না বুঝি? মাস্টার কেলাসে রোজ পড়া জিজ্ঞাসা করত, ও একদিনও বলতে পারত না। মাস্টার একদিন ওকে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলে ও এন্‌সার করতে পারলে না। আমায় জিজ্ঞাসা করতেই আমি বললাম। মাস্টার আমায় বললে, দাও ওর কান মলে। আমি কান মলে দিতেই, ওর মুখচোখ রাগে লাল হয়ে গেল। ও বলতে লাগল, আমি হলাম বামুনের ছেলে, ও কায়েত হয়ে কিনা আমার কানে হাত দেয়। সেই অপমানে ও-ই তো ইস্কুল ছেড়ে দিলে। আমি তারপর পাঁচ-ছ বছর সেই ইস্কুলে পড়ে, একেবারে লায়েক হয়ে তবে বেরুলাম।"

অতঃপর গোঁসাইগঞ্জের লোক, নন্দীপুর কর্তৃক ব্যক্ত ওই অপবাদের প্রতিবাদ করিতে লাগিল। অবশেষে হারান মাস্টার বলিল, "আমরা ইস্কুলে যে মাস্টারের কাছে পড়তাম তিনি আজও বেঁচে আছেন। গোঁসাইগঞ্জ থেকে তোমরা দুজন মাতব্বর লোক আমার সঙ্গে চল তাঁর কাছে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখো, কার কথা সত্যি আর কার কথা মিথ্যে।"

এই কথা শুনিয়া ব্রজ মাস্টার হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, "হাঁ! এই কথা বলেছে? ও সব বিলকুল ফল্‌সো—মিথ্যে কথা। সেই মাস্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে ভজিয়ে দেবে? তিনি কি আর বেঁচে আছেন? গেল বছরের আগের বছর, তিনি যে হেভেন—স্বর্গে গেলেন। তাঁর শ্রাদ্ধে আমি ইনভাইট—নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি। বেশ মনে আছে। আমাকে বড্ড ভালোবাসতেন যে। একেবারে সন্‌ইকোয়েল—পুত্রতুল্য। তাঁর ছেলেরাও আজও আমায় বোজো দাদা বলতে ইগ্নোরেন্ট—অজ্ঞান।"

উভয় মাস্টারের পরস্পরের প্রতি এই তীব্র অপবাদ প্রয়োগের ফল এই হইল, উভয়

গ্রামই স্ব স্ব মাস্টারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল।

অবশেষে স্থির হইল, কোনো প্রকাশ্য স্থানে দুইজনের মধ্যে বিচার হউক, কে কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে দেখা যাউক।

উভয় গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন, উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর যে বটবৃক্ষ আছে তাহারই নিম্নে বিচারসভা বসিবে।

কিন্তু উভয় গ্রামের লোকই ইংরেজিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং যাহাতে জয় পরাজয় সম্বন্ধে কাহারও মনে কিছুমাত্র সংশয় না থাকে এমন একটি সরল বিচার প্রণালী স্থির করা আবশ্যক। উভয় গ্রামের সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে মাস্টারেরা পরস্পরকে একটি ইংরেজি কথার মানে জিজ্ঞাসা করিবে, অপরকে তার মানে বলিতে হইবে। যদি উভয়েই বলিতে পারেন তবে উভয়ে তুল্যমূল্য। একজন অন্যকে ঠকাইতে পারিলে, তিনিই জয়পত্র পাইবেন।

বিচারের দিন স্থির হইল আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা; স্থান—উপরিউক্ত বটবৃক্ষতল; সময় সূর্যাস্ত। ধার্য দিনে সূর্যাস্তের পূর্বেই গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর ব্যক্তিগণ ব্রজ মাস্টারকে সঙ্গে লইয়া বটবৃক্ষ অভিমুখে শোভাযাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ঢাকঢোল কাড়া-নাকাড়া প্রভৃতি বাদ্যকরগণ আছে এবং এক ব্যক্তি একটি বৃহৎ রামশিঙা লইয়া চলিয়াছে—ঈশ্বরেচ্ছায় যদি জয় হয়, তবে ঢাকঢোল পিটাইয়া আনন্দ করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

পথে যাইতে যাইতে ব্রজ মাস্টারের পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন— "কী হে মাস্টার মুখ রাখতে পারবে তো? বেছে বেছে খুব শক্ত একটা কিছু বের করে রাখো, হারান মাস্টার যেন কিছুতেই তার মানে না বলতে পারে।" ব্রজবাবু বলিলেন, "আপনারা ভাবছেন কেন, দেখুন না কী করি। এমন কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করব যে তা শুনেই হারান মাস্টারের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে—মানে বলা তো দূরের কথা!" দত্তজা বলিলেন, "দেখো ভায়া, আজ যদি মুখ রাখতে পারো তবে তোমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব।" কেহ স্পষ্ট না বলিলেও ব্রজ মাস্টার ইহা বিলক্ষণ জানিতেন যে আজ যদি তাঁহার পরাজয় ঘটে, তবে এ গ্রাম কল্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বেই গোঁসাইগঞ্জের দল বটবৃক্ষতলে উপনীত হইল। শপ মাদুর সতরঞ্জি প্রভৃতি বাহকেরা তৎপূর্বেই আনিয়া, নিজ গ্রামের সীমারেখার উপর সেগুলি বিছাইয়া রাখিয়াছে। দূরে পঙ্গপালের মতো নন্দীপুরবাসীগণ আসিতেছে দেখা গেল।

তাহাদের সঙ্গেও শপ, মাদুর প্রভৃতি ও ঢাক ঢোল ইত্যাদি আসিতেছে। ক্রমে নন্দীপুর আসিয়া নিজ সীমানার নিকট শপ, মাদুর বিছাইয়া বসিয়া গেল। উভয় গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সম্মুখে বসিয়াছেন, মধ্যে দুই-তিন হাত মাত্র খালি জমি।

এখন প্রশ্ন উঠিল, কোন্ মাস্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবেন। উভয় গ্রামই প্রথম জিজ্ঞাসার অধিকার দাবি করিল। কোনো পক্ষই নিজ দাবি ত্যাগ করিতে সম্মত নহে। অবশেষে বৃদ্ধগণ মীমাংসা করিয়া দিলেন। হীরু দত্ত মহাশয় একটি ছড়ি ঘুরাইয়া ঊর্ধ্বে ছুড়িয়া দিউন, ছড়ি যে গ্রামের অভিমুখে মাথা করিয়া পড়িবে, সেই গ্রামের মাস্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার পাইবেন। "আমার ছড়ি লউন—আমার ছড়ি লউন" বলিয়া উভয় গ্রামের অনেকেই ছুটিয়া আসিল। হাতের কাছে যে ছড়িটি পাইলেন, তাহা লইয়া হীরু দত্ত সজোরে ঘুরাইয়া ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিলেন। ক্রমে ছড়ি আসিয়া ভূমিতে পতিত হইল। সকলে দেখিল তাহার মাথাটি নন্দীপুরের দিকে হেলিয়া রহিয়াছে।

নন্দীপুর ইহা দেখিয়া সোল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিল; গোঁসাইগঞ্জের মুখটি চুন হইয়া গেল। সকলে সাগ্রহে বিচারফলের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

নন্দীপুরের হারান মাস্টার তখন বুক ফুলাইয়া সম্মখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; ব্রজ মাস্টারও উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার বুকটি দুরু দুরু করিতে লাগিল; কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় মুখে সে ভাবকে তিনি প্রকাশ করিতে দিলেন না।

হারান মাস্টার তখন বলিলেন, "আচ্ছা বলো দেখি, এর মানে কী?—

HORNS OF A DILEMMA"

সৌভাগ্যক্রমে ব্রজ মাস্টার এই কূট প্রশ্নের অর্থ অবগত ছিলেন। তিনি বুক ফুলাইয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, "এর মানে—উভয়সংকট—কেমন কি না?"

"পেরেছে পেরেছে আমাদের মাস্টার পেরেছে"—বলিয়া গোঁসাইগঞ্জ তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। দলপতিগণ অনেক কষ্টে তাহাদের থামাইলেন। এবার ব্রজ মাস্টার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—

"শোনো হারানবাবু, আমি তোমায় কোনো কঠিন প্রশ্ন করতে চাইনে; বরং খুব সহজ দেখেই একটা জিজ্ঞাসা করব। এ অঞ্চলে মনে করো তুমি আর আমি, এই দুজন যা ইংরেজিনবিশের আছি। একটা শক্ত কথার মানে জিজ্ঞাসা করে তোমায় ঠকিয়ে দেব, সেটা আমার মনঃপুত নয়। এতে হয়তো গোঁসাইগঞ্জ রাগ করতে পারেন—কিন্তু আমি

নিজে একজন ইংরেজনবিশ হয়ে, আর একজন ইংরেজনবিশের প্রকাশ্য সভায় অপমান তো করতে পারিনে! আচ্ছা খুব সহজ একটা কথার মানে জিজ্ঞাসা করি—বেশ হেঁকে উত্তর দাও, যাতে দুই গ্রামের সকলে শুনতে পায়। আচ্ছা এর মানে কী বলো দেখি—তুমি জানো নিশ্চয়ই।

—আচ্ছা এর মানে বলো — I DON'T KNOW

হারান মাস্টার উচ্চস্বরে বলিল— "আমি জানি না।"

শ্রবণমাত্র নন্দীপুরের সকলের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সেই মুহূর্তে গোঁসাইগঞ্জের দল একসঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিপুল বেগে নৃত্য ও চিৎকার করিতে লাগিল।

— "হো হো জানে না—নন্দীপুর জানে না—হেরে গেল, দুও—দুও।"

হারান মাস্টার মহাবিপন্নভাবে সকলকে কী বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় গোঁসাইগঞ্জের ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাকাড়া ও রামশিঙা সমবেতভাবে গর্জন করিয়া উঠিল। তাঁহার কথা আর কাহারও শ্রুতিগোচর হইবার সম্ভাবনা রহিল না। গোঁসাইগঞ্জ নিবাসী কয়েকজন বলশালী লোক আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল, এবং তন্মধ্যে একজন ব্রজ মাস্টারকে স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে, বাদ্যভাণ্ডের সহিত গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন শুনা গেল হারান মাস্টার নন্দীপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তথায় স্কুলটি বন্ধ হইয়া গেল। গোঁসাইগঞ্জের ব্রজ মাস্টার অপ্রতিহত প্রভাবে মাস্টারি এবং গ্রামস্থ সকলের অপত্য নির্বিশেষে ক্ষীর, ননী, ছানা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অভাগীর স্বর্গ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এক

ঠাকুরদাস মুখুজ্জের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাতদিনের জ্বরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সংগতিপন্ন। তাঁর চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলেমেয়েদের ছেলেপুলে হইয়াছে, জামাইরা— প্রতিবেশীর দল, চাকর-বাকর—সে যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধুমধামের শবযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আলতা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দূর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে শাশুড়ির দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছাইয়া লইল। পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোনো শোকের ব্যাপার—এ যেন বড়ো বাড়ির গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নতুন করিয়া তাঁহার স্বামীগৃহে যাত্রা করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষবিদায় দিয়া অলক্ষে দুফোঁটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত-আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আর একটি প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল। সে কাঙালির মা। সে তাহার কুটির প্রাঙ্গণের গোটা-কয়েক বেগুন তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না। রহিল তাহার হাটে যাওয়া, রহিল তাহার আঁচলে বেগুন বাঁধা—সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকলের পিছনে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের একান্তে গরুড় নদীর তীরে শ্মশান। সেখানে পূর্বাহ্ণেই কাঠের ভার, চন্দনের টুকরা, ঘৃত, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল, কাঙালির মা ছোটোজাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না, তফাতে একটা উঁচু ঢিপির মধ্যে দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্যাপ্ত

চিতার পরে যখন শব স্থাপিত করা হইল তখন তাঁহার রাঙা পা-দুখানি দেখিয়া তাহার দুচক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আলতা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহুকণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপূত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিল, ভাগ্যিমানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্চো—আমাকেও আশীর্বাদ করে যাও, আমিও যেন এমনি কাঙালির হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন! সে তো সোজা কথা নয়! স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনি, দাস, দাসী, পরিজন—সমস্ত সংসার উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ—দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল—এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্য-প্রজ্বলিত চিতার অজস্র ধোঁয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালির মা ইহারই মধ্যে ছোটো একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতাপাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছে—মুখ তাহার চেনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাঁহার সিঁদুরের রেখা, পদতল দুটি আলতায় রাঙানো। ঊর্ধ্বদৃষ্টে চাহিয়া কাঙালির মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময়ে একটি বছর চোদ্দো-পনেরোর ছেলে তাহার আঁচলে টান দিয়া কহিল, হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস মা, ভাত রাঁধবিনে?

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, রাঁধব খন রে! হঠাৎ উপরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, দ্যাখ দ্যাখ বাবা—বামুন-মা ওই রথে চড়ে সগ্যে যাচ্ছে!

ছেলে বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, কই? ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, তুই খেপেছিস! ও তো ধুঁয়া! রাগ করিয়া কহিল, বেলা দুপুর বাজে, আমার খিদে পায় না বুঝি? এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখের জল লক্ষ করিয়া বলিল, বামুনের গিন্নি মরছে তুই কেন কেঁদে মরিস মা?

কাঙালির মার এতক্ষণে হুঁশ হইল। পরের জন্য শ্মশানে দাঁড়াইয়া এইভাবে অশ্রুপাত করায় সে মনে মনে লজ্জা পাইল, এমনকি ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় মুহূর্তে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কাঁদব কীসের জন্যে রে!—চোখে ধোঁ লেগেছে বই তো নয়।

হাঃ—ধোঁ লেগেছে বই তো না! তুই কাঁদতেছিলি।

মা আর প্রতিবাদ করিল না। ছেলের হাত ধরিয়া ঘাটে নামিয়া নিজেও স্নান করিল, কাঙালিকেও স্নান করাইয়া ঘরে ফিরিল—শ্মশান সৎকারের শেষটুকু দেখা আর তার

ভাগ্যে ঘটিল না।

দুই

সন্তানের নামকরণকালে পিতামাতার মূঢ়তায় বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজের নামগুলাকেই যেন আমরণ ভ্যাঙচাইয়া চলিতে থাকে। কাঙালির মার জীবনের ইতিহাস ছোটো, কিন্তু সেই ছোট্ট কাঙালজীবনটুকু বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে জন্ম দিয়া মা মরিয়াছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী। মা নাই, বাপ নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, তাহার না আছে দিন, না আছে রাত। তবু যে কী করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙালির মা হইতে বাঁচিয়া রহিল সে এক বিস্ময়ের বস্তু। যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহার নাম রসিক বাঘ, বাঘের অন্য বাঘিনি ছিল, ইহাকে লইয়া সে গ্রামান্তরে উঠিয়া গেল, অভাগী তাহার অভাগ্য ও শিশুপুত্র কাঙালিকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিল।

তাহার সেই কাঙালি বড়ো হইয়া আজ পনেরোয় পা দিয়াছে। সবেমাত্র বেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাগীর আশা হইয়াছে আরও বছরখানেক তাহার অভাগ্যের সহিত যুঝিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবে। এই দুঃখ যে কী, যিনি দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না।

কাঙালি পুকুর হইতে আঁচাইয়া আসিয়া দেখিল তাহার পাতের ভুক্তাবশেষ মা একটা মাটির পাত্রে ঢাকিয়া রাখিতেছে, আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই খেলিনে মা?

বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর খিদে নেই।

ছেলে বিশ্বাস করিল না, বলিল, না খিদে নেই বই কি! কই, দেখি তোর হাঁড়ি?

এই ছলনায় বহুদিন কাঙালির মা কাঙালিকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে। সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল। তাহাতে আর একজনের মতো ভাত ছিল। তখন সে প্রসন্নমুখে মায়ের কোলে গিয়া বসিল। এই বয়সের ছেলে সচরাচর এরূপ করে না, কিন্তু শিশুকাল হইতে বহুকাল যাবৎ সে রুগ্‌ণ ছিল বলিয়া মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরের সঙ্গীসাথিদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় নাই। এইখানে বসিয়াই তাহাকে খেলাধুলার সাধ মিটাইতে হইয়াছে। একহাতে গলা জড়াইয়া, মুখের উপর মুখ রাখিয়াই কাঙালি চকিত হইয়া কহিল, মা, তোর গা যে গরম, কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মড়া-পোড়ানো দেখতে গেলি? কেন আবার নেয়ে এলি? মড়া-পোড়ানো কি তুই—

মা শশব্যস্তে ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়া রহিল, ছি বাবা, মড়া-পোড়ানো বলতে নেই, পাপ হয়। সতী-লক্ষ্মী মা-ঠাকরুন রথে করে সগ্যে গেলেন।

ছেলে সন্দেহ করিয়া কহিল, তোর এক কথা মা! রথে চড়ে কেউ নাকি আবার সগ্যে যায়।

মা বলিল, আমি যে চোখে দেখনু কাঙালি, বামুন-মা রথের উপরে বসে। তেনার রাঙা পা-দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখলে রে!

সবাই দেখলে?

সব্বাই দেখলে।

কাঙালি মায়ের বুকে ঠেস দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মাকে বিশ্বাস করাই তাহার অভ্যাস, বিশ্বাস করিতেই সে শিশুকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছে, সেই মা যখন বলিতেছে সবাই চোখ মেলিয়া এতবড়ো ব্যাপার দেখিয়াছে, তখন অবিশ্বাস করিবার আর কিছু নাই। খানিক পরে আস্তে আস্তে কহিল, তাহলে তুইও তো মা সগ্যে যাবি? বিন্দির মা সেদিন রাখালের পিসিকে বলতেছিল, ক্যাঙলার মার মতো সতী-লক্ষ্মী আর দুলে পাড়ায় নেই।

কাঙালির মা চুপ করিয়া রহিল, কাঙালি তেমনি ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, বাবা যখন তোরে ছেড়ে দিলে, তখন তোরে কত লোকে তো নিকে করতে সাধাসাধি করলে। কিন্তু তুই বললি, না। বললি, কাঙালি বাঁচলে আমার দুঃখ ঘুচবে, আবার নিকে করতে যাব কীসের জন্যে? হাঁ মা, তুই নিকে করলে আমি কোথায় থাকতুম? আমি হয়তো না খেতে পেয়ে এতদিনে কবে মরে যেতুম।

মা ছেলেকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিল। বস্তুত, সেদিন তাহাকে এ পরামর্শ কম লোকে দেয় নাই, এবং যখন সে কিছুতেই রাজি হইল না, তখন উৎপাত-উপদ্রবও তাহার প্রতি সামান্য হয় নাই, সেই কথা স্মরণ করিয়া অভাগীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলে হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, ক্যাঁতাটা পেতে দেব মা, শুবি?

মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালি মাদুর পাতিল, কাঁথা পাতিল, মাচার উপর হইতে ছোটো বালিশটা পাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানায় টানিয়া লইয়া যাইতে, মা কহিল, কাঙালি, আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই।

কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব কাঙালির খুব ভালো লাগিল, কিন্তু কহিল, জলপানির

পয়সা দুটো তো তাহলে দেবে না মা!

না দিক গে—আয় তোকে রূপকথা বলি।

আর প্রলুব্ধ করিতে হইল না, কাঙালি তৎক্ষণাৎ মায়ের বুক ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, বল তাহলে। রাজপুত্তুর, কোটালপুত্তুর আর সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া—

অভাগী রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা দিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এ-সকল তাহার পরের কাছে কতদিনের শোনা এবং কতদিনের বলা উপকথা। কিন্তু মুহূর্তকয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, আর কোথায় গেল তাহার কোটালপুত্র—সে এমন উপকথা শুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয়—নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত বাড়িতে লাগিল, উষ্ণ রক্তস্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে বহিতে লাগিল, ততই সে যেন নব নব উপকথার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—

কাঙালির স্বল্প দেহ বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, পুলকে সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।

বাহিরে বেলা শেষ হইল, সূর্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া চরাচর ব্যাপ্ত করিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিল না, গৃহস্থের শেষ কর্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকারে কেবল রুগ্‌ণ মাতার অবাধ গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই শ্মশান ও শ্মশানযাত্রার কাহিনি। সেই রথ, সেই রাঙা পা-দুটি, সেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া! কেমন করিয়া শোকার্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কী করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তার পরে সন্তানের হাতের আগুন। সে আগুন তো আগুন নয় কাঙালি, সে তো হরি! তার আকাশ জোড়া ধুঁয়ো তো ধুঁয়ো নয় বাবা, সেই তো সগ্যের রথ। কাঙালিচরণ, বাবা আমার।

কেন মা?

তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, বামুন-মার মতো আমিও সগ্যে যেতে পাব।

কাঙালি অস্ফুটে শুধু কহিল, যাঃ—বলতে নেই।

মা সে কথা বোধ করি শুনিতেও পাইল না, তপ্তনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, ছোটোজাত বলে তখন কিন্তু কেউ ঘেন্না করতে পারবে না—দুঃখী বলে কেউ ঠেকিয়ে

রাখতে পারবে না। ইস্। ছেলের হাতের আগুন—রথকে যে আসতেই হবে।

ছেলে মুখের উপর মুখ রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, বলিসনে মা, বলিসনে, আমার বড্ড ভয় করে।

মা কহিল, আর দেখ্ কাঙালি, তোর বাবাকে একবার ধরে আনবি, অমনি যেন পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে আমাকে বিদায় দেয়। অমনি পায়ে আলতা, মাথায় সিঁদুর দিয়ে—কিন্তু কে বা দেবে? তুই দিবি, না রে কাঙালি? তুই আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে, তুই আমার সব! বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

তিন

অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল। বিস্তৃতি বেশি নয়, সামান্যই। বোধ করি ত্রিশটা বৎসর আজও পার হইয়াছে কি হয় নাই, শেষ হইল তেমনি সামান্যভাবে। গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন গ্রামে তাঁহার বাস। কাঙালি গিয়া কাঁদাকাটি করিল, হাতে-পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে একটাকা প্রণামি দিল। তিনি আসিলেন, গোটা-চারেক বড়ি দিলেন। তাহার কত কী আয়োজন। খল, মধু, আদার সত্ত, তুলসীপাতার রস—কাঙালির মা ছেলের প্রতি রাগ করিয়া বলিল, কেন তুই আমাকে না বলে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি বাবা! হাত পাতিয়া বড়ি কয়টি গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উনানে ফেলিয়া দিয়া কহিল, ভালো হই তো এতেই হব, বাগদি-দুলের ঘরে কেউ কখনও ওষুধ খেয়ে বাঁচে না।

দিন দুই-তিন এমনই গেল। প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিতে আসিল, যে যাহা মুষ্টিযোগ জানিত, হরিণের শিং -ঘষা জল, গেঁটে-কড়ি পুড়াইয়া মধুতে মাড়িয়া চাটাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিয়া যে যাহার কাজে গেল। ছেলেমানুষ কাঙালি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে, মা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, কোবরেজের বড়িতে কিছু হল না বাবা, আর ওদের ওষুধে কাজ হবে? আমি এমনি ভালো হব।

কাঙালি কাঁদিয়া কহিল, তুই বড়ি তো খেলি নে মা, উনুনে ফেলে দিলি। এমনি কী কেউ সারে?

আমি এমনি সেরে যাব। তার চেয়ে তুই দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খা দিকি, আমি চেয়ে দেখি।

কাঙালি এই প্রথম অপটু হস্তে ভাত রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। না পারিল ফ্যান ঝাড়িতে,

না পারিল ভালো করিয়া ভাত বাড়িতে। উনান তাহার জ্বলে না—ভিতরে জল পড়িয়া ধোঁয়া হয়, ভাত ঢালিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, মায়ের চোখ ছলছল করিয়া আসিল। নিজে একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা সোজা করিতে পারিল না, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। খাওয়া হইয়া গেলে ছেলেকে কাছে লইয়া কী করিয়া কী করিতে হয় বিধিমতে উপদেশ দিতে গিয়া তাহার ক্ষীণকণ্ঠ থামিয়া গেল, চোখ দিয়া কেবল অবিরলধারে জল পড়িতে লাগিল।

গ্রামে ঈশ্বর নাপিত নাড়ি দেখিতে জানিত, পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সুমুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালির মা ইহার অর্থ বুঝিল, কিন্তু তাহার ভয়ই হইল না। সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, এইবার একবার তাকে ডেকে আনতে পারিস বাবা?

কাকে মা?

ওই যে রে—ও-গাঁয়ে উঠে গেছে—

কাঙালি বুঝিয়া কহিল, বাবাকে?

অভাগী চুপ করিয়া রহিল।

কাঙালি বলিল, সে আসবে কেন মা?

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল, গিয়ে বলবি, মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধুলো চায়।

সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু কাঁদাকাটা করিস বাবা, বলিস মা যাচ্ছে।

একটু থামিয়া কহিল, ফেরবার পথে অমনি নাপতে-বউদির কাছ থেকে একটু আলতা চেয়ে আনিস কাঙালি, আমার নাম করলেই সে দেবে। আমাকে বড়ো ভালোবাসে।

ভালো তাহাকে অনেকেই বাসিত। জ্বর হওয়া অবধি মায়ের মুখে সে এই কয়টা জিনিসের কথা এতবার এতরকম করিয়া শুনিয়াছে যে, সে সেইখান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিল।

চার

পরদিন রসিক দুলে সময়মতো যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন অভাগীর আর বড়ো জ্ঞান নাই। মুখের পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি এ সংসারের কাজ

সারিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গেছে। কাঙালি কাঁদিয়া কহিল, মাগো! বাবা এসেছে—পায়ের ধুলো নেবে যে!

মা হয়তো বুঝিল, হয়তো বুঝিল না, হয়তো তাহার গভীর সঞ্চিত বাসনা সংস্কারের মতো তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। এই মৃত্যুপথযাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া হাত পাতিল।

রসিক হতবুদ্ধির মতো দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধুলার প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ নাকি চাহিতে পারে তাহা তাহার কল্পনার অতীত। বিন্দির পিসি দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধুলো।

রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালোবাসা দেয় নাই, অশন-বসন দেয় নাই, কোনো খোঁজখবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধুলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাখালের মা বলিল, এমন সতী-লক্ষ্মী বামুন-কায়েতের ঘরে না জন্মে, ও আমাদের দুলের ঘরে জন্মাল কেন! এইবার ওর একটু গতি করে দাও বাবা ক্যাঙলার হাতের আগুনের লোভে ও যেন প্রাণটা দিলে।

অভাগীর অভাগ্যের দেবতা অগোচরে বসিয়া কী ভাবিলেন জানি না, কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙালির বুকে গিয়া এ কথা যেন তিরের মতো বিঁধিল।

সেদিন দিনের বেলাটা কাটিল, প্রথম রাত্রিটাও কাটিল, কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালির মা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। কী জানি, এত ছোটোজাতের জন্যও স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি না, কিংবা অন্ধকার পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়—কিন্তু এটা বোঝা গেল, রাত্রি শেষ না হইতেই এ দুনিয়া সে ত্যাগ করিয়া গেছে।

কুটির প্রাঙ্গণে একটা বেলগাছ, একটা কুড়ুল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দারোয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কষাইয়া দিল, কুড়ুল কাড়িয়া লইয়া কহিল, শালা, এ কি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেছিস?

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল, কাঙালি কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ, এ যে আমার মায়ের হাতে পোঁতা গাছ, দারোয়ানজি। বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন?

হিন্দুস্থানি দারোয়ান তাহাকেও একটা অশ্রাব্য গালি দিয়া মারিতে গেল, কিন্তু সে

নাকি তাহার জননীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়াছিল, তাই অশৌচের ভয়ে তাহার গায়ে হাত দিল না। হাঁকাহাঁকিতে একটা ভিড় জমিয়া উঠিল, কেহই অস্বীকার করিল না যে বিনা অনুমতিতে রসিকের গাছ কাটতে যাওয়া ভালো হয় নাই। তাহারাই আবার দারোয়ানজির হাতে-পায়ে পড়িতে লাগিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটা হুকুম দেন। কারণ, অসুখের সময় যে-কেহ দেখিতে আসিয়াছে কাঙালির মা তাহারই হাতে ধরিয়া তাহার শেষ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া গেছে।

দারোয়ান ভুলিবার পাত্র নহে, সে হাত-মুখ নাড়িয়া জানাইল, এ-সকল চালাকি তাহার কাছে খাটিবে না।

জমিদার স্থানীয় লোক নহেন, গ্রামে তাঁহার একটা কাছারি আছে, গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্তা। লোকগুলো যখন হিন্দুস্থানিটার কাছে ব্যর্থ অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল, কাঙালি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারি-বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুস লয়, তাহার নিশ্চয়ই বিশ্বাস হইল অত বড়ো অসংগত অত্যাচারের কথা যদি কর্তার গোচর করিতে পারে তো ইহার প্রতিবিধান না হইয়াই পারে না। হায় রে অনভিজ্ঞ! বাংলাদেশের জমিদার ও তাহার কর্মচারীকে সে চিনিত না। সদ্যমাতৃহীন বালক শোকে ও উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল, অধর রায় সেইমাত্র সন্ধ্যাহ্নিক ও যৎসামান্য জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়াছিলেন, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, কে রে?

আমি কাঙালি। দারোয়ানজি আমার বাবাকে মেরেছে।

বেশ করেছে। হারামজাদা খাজনা দেয়নি বুঝি?

কাঙালি কহিল, না বাবুমশায়, বাবা গাছ কাটতেছিল—আমার মা মরেছে—বলিতে বলিতে সে কান্না আর চাপিতে পারিল না।

সকালবেলা এই কান্নাকাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ছোঁড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে, কী জানি এখানকার কিছু ছুঁইয়া ফেলিল নাকি। ধমক দিয়া বলিলেন, মা মরেছে তো যা নীচে নেবে দাঁড়া। ওরে কে আছিস রে, এখানে একটু গোবরজল ছড়িয়ে দে! কী জাতের ছেলে তুই?

কাঙালি সভয়ে প্রাঙ্গণে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দুলে।

অধরা কহিলেন, দুলে! দুলের মড়ায় কাঠ কী হবে শুনি?

কাঙালি বলিল, মা যে আমাকে আগুন দিতে বলে গেছে। তুমি জিজ্ঞেস করো না বাবুমশায়, মা যে সবাইকে বলে গেছে, সক্কলে শুনেছে যে! মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার অনুক্ষণের সমস্ত অনুরোধ উপরোধ মুহূর্তে স্মরণ হইয়া কণ্ঠ যেন তাহার কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।

অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি তো গাছের দাম পাঁচটাকা আন্ গে। পারবি?

কাঙালি জানিত তাহা অসম্ভব। তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যস্বরূপ তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসি একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, সে ঘাড় নাড়িল, বলিল, না।

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন, না তো, মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেল গে যা। কার বাবার গাছে তোর বাপ কুড়ুল ঠেকাতে যায়—পাজি, হতভাগা, নচ্ছার!

কাঙালি বলিল, সে যে আমাদের উঠানের গাছ বাবুমশায়! সে যে আমার মায়ের হাতে পোঁতা গাছ।

হাতে পোঁতা গাছ! পাঁড়ে, ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে তো!

পাঁড়ে আসিয়া গলাধাক্কা দিল, এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল যাহা কেবল জমিদারের কর্মচারীরাই পারে।

কাঙালি ধুলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তার পরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেন সে যে মার খাইল, কী তাহার অপরাধ, ছেলেটা ভাবিয়াই পাইল না। গোমস্তার নির্বিকার চিত্তে দাগ পর্যন্ত পড়িল না। পড়িলে এ চাকরি তাহার জুটিত না। কহিলেন, পরেশ, দেখো তো হে, এ ব্যাটার খাজনা বাকি পড়েছে কি না। থাকে তো জাল-টাল কিছু একটা কেড়ে এনে যেন রেখে দেয়—হারামজাদা পালাতে পারে।

মুখুজ্জে বাড়িতে শ্রাদ্ধের দিন—মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকি। সমারোহের আয়োজন গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাস নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, কাঙালি আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল, কহিল, ঠাকুরমশাই, আমার মা মরে গেছ।

তুই কে? কী চাস তুই?

আমি কাঙালি। মা বলে গেছে তেনাকে আগুন দিতে।

তা দি গে না।

কাছারির ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, একজন কহিল ও বোধ হয় একটা গাছ চায়। — এই বলিয়া সে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কহিল।

মুখুজ্জে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, শোনো আবদার। আমারই কত কাঠের দরকার—কাল বাদে পরশু কাজ। যা যা, এখানে কিছু হবে না—এখানে কিছু হবে না। এই বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

ভট্টাচার্যমহাশয় অদূরে বসিয়া ফর্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে? যা মুখে একটু নুড়ো জ্বেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দে গে।

মুখোপাধ্যায়মহাশয়ের বড়োছেলে, ব্যস্তসমস্তভাবে এই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, দেখছেন ভট্চাযমশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন-কায়েত হতে চায়। বলিয়া কাজের ঝোঁকে আর কোথায় চলিয়া গেলেন।

কাঙালি আর প্রার্থনা করিল না। এই ঘন্টা দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর চরে গর্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ানো হইল। রাখালের মা কাঙালির হাতে একটা খড়ের আঁটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তার পরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালির মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত—শুধু সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধোঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালি উর্ধ্বদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

দুর্ঘটনা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সেভেন আপ দিল্লি এক্সপ্রেস—ডাকনাম যাহার তুফান মেল—তাহারই একখানা থার্ড ক্লাস কামরায় আমাদের নাটকের আরম্ভ এবং সেইখানেই যবনিকা।

গাড়িতে সেদিন কী কারণে জানি না, অসম্ভব ভিড় হইয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশেরই কিছু কিছু লোক হরেক রকমের মোটঘাট লইয়া কামরাগুলিকে একেবারে ভরাইয়া তুলিয়াছিলেন এবং প্রবেশপথের অবস্থা চক্রব্যূহের অপেক্ষাও দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সেই অবস্থার মধ্যেও শেষ মুহূর্তে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক যখন সকলকে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া সকলের তারস্বর প্রতিবাদে কর্ণপাত-মাত্র না করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, তখন যে আমরা সকলেই বিরক্ত হইয়াছিলাম তাহা বলা বাহুল্য।

সুবিধার মধ্যে ভদ্রলোকের সঙ্গে মোটঘাট বিশেষ ছিল না, একটি স্যুটকেস মাত্র হাতে করিয়া তিনি উঠিলেন। কিন্তু বাঙ্ক বা মেঝে কোথাও ব্যাগটি রাখিবার তিলমাত্র স্থান না দেখিয়া হাতে করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং চারিদিকের মিলিত ক্রুদ্ধ দৃষ্টির মধ্যে অবিচলিতভাবে দাঁড়াইয়া চাদরের খুঁটে ঘাম মুছিতে লাগিলেন।

ট্রেন ছাড়িবার অল্প কিছুক্ষণ পরেই সহসা তাঁহার নজরে পড়িল ওধারে একটি ভদ্রলোক জানালার ওপর হাত রাখিয়া কনুইটি বাহির করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, ও মশাই! ও দাদা—দয়া করে কনুইটা ভেতরে টেনে নিন, আমি হাত জোড় করছি।

কনুই-এর মালিক হাত ভিতরে টানিয়া লইলেন বটে কিন্তু অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উপস্থিত অন্য সকলেরও প্রায় সেই অবস্থা। তাঁহার ব্যাকুলতা কিন্তু হাত টানিয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছিল। তিনি অতঃপর ধীরে-সুস্থে আমাদের দিকে চাহিয়া কারণটা বিবৃত

করিলেন, এখনও পাঁচটি দিন হয়নি মশাই, ওয়ালটেয়ার থেকে আসছিলুম মাদ্রাজ মেলে, এক ভদ্রলোক অমনি কনুই বার করে বসেছিলেন। দেখতে দেখতে মশাই আমার চোখের সামনে—হাতখানি তিন টুকরো! কনুইটা রইল বাহিরে, বগল আর হাত ভেতরে চলে এল।

চারিদিক হইতে একটা বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠিল। যিনি কনুই বাহির করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহারও রীতিমতো মুখ শুকাইয়া গেল।

—বলেন কী মশাই!

—আজ্ঞে, তবে আর অত ব্যস্ত হলুম কেন বলুন!

ওধারের বেঞ্চ হইতে একটি মাড়োয়ারি যুবক বলিয়া উঠিল, লেকিন ক্যায়সে কাটা বাবুজি?

ভদ্রলোক একটু যেন উষ্মভাবেই কহিলেন, এটা আর সমঝা নেহি? পাথর! পাথর! পাহাড়কা উপরসে পাথর গিরা!

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিলাম, বলেন কী মশাই!...পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর পড়ে বেচারার হাতটা কেটে গেল?

—যাবে না? সে কি যা তা পাথর? অন্তত আট-ন মন ওজন হবে!

একজন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ট্রেনে জার্নি করা প্রাণ হাতে করে।

—কিচ্ছু বিশ্বাস নেই মশাই, বুঝলেন? যতক্ষণ না ফিরে আসছেন ততক্ষণ বিশ্বাস নেই। ... এই ত মাস-খানেকের কথা, দানাপুর স্টেশনে গাড়ি থেমেছে, আমাদের ম্যাকলিন কোম্পানির হরেবাবু স্টলে গেছেন চা খেতে; ফিরে আসছেন, আসতে আসতেই গাড়িটা দিয়েছে ছেড়ে। ও মশাই, সামান্য স্পিড, কিন্তু ভদ্রলোক একটুখানি পা পিছলে যেমন গলে পড়ে গেলেন আর অমনি দু-টুকরো।

আবারও সেই অস্ফুট গুঞ্জন। অনেকেরই মুখ শুকাইয়া উঠিল, বোধ হয় নিজেদের ইতি পূর্বেকার চলন্ত ট্রেনে উঠিবার ইতিহাস স্মরণ করিয়া। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাঁহার যুবক সঙ্গীকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, হাতরাস থেকে মথুরার ট্রেন ধরে কাজ নেই, বরং বাসে গেলেই হবে।

আমাদের নবাগত ভদ্রলোকটি আরও যেন তাতিয়া উঠিলেন, বাস? ও আরও ডেঞ্জারাস। শুনবেন তা হলে বাসের কথা? আমার এক মাস্টারমশাই আসছিলেন তমলুক থেকে বাসে করে—পাঁশকুড়োর ট্রেন ধরবার জন্যে। হঠাৎ মোড় ঘুরেই দেখা গেল, রাস্তার ওপর গোটাতিনেক ছাগল-ছানা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বাঁচাবার

জন্য ড্রাইভার যেমন পাশ কাটাতে গেছে, একেবারে উঁচু রাস্তার ওপর থেকে গড়াতে গড়াতে বাসসুদ্ধ চলে গেল নীচের জমিতে। সতেরো জন প্যাসেঞ্জারের মধ্যে তিনজন তখনই মারা গেল, আর দুজন হাসাপাতালে পৌঁছে গেল; বাকি সকলকে মাস-ছয়েক করে ঝোল ভাত খেতে হল। শুধু ড্রাইভার ভালো ছিল, তার কিছু হয়নি।

শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেরই এই বর্ণনায় গা-মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। আমার তো রীতিমতো পেট ব্যথা করিতে শুরু করিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে প্রথম ভয়ের ব্যাপারটা কাটিতে আমাদের বিরাজবাবু সেই মথুরাযাত্রী বৃদ্ধটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ও বাসে-ফাসে কখনও চড়তে নেই মশাই, ভারী বিপজ্জনক! যদি নিজের মোটর থাকে, কিম্বা ট্যাক্সি—

—তাতেই বা কী সুবিধে মশাই? সেদিন কাগজে পড়েননি, বড়োবাজারের এক মহাজনের কী দুর্গতি? উপযুক্ত ছেলে, এক ছেলে, নিজে মোটর চালিয়ে ডায়মন্ডহারবার বেড়াতে গেল আর ফিরল না। খোঁজ খোঁজ—অনেক খুঁজে দেখা গেল যে, গড়ের হাটের কাছে এক বিরাট বটগাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মোটরখানা ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ে রয়েছে, আর তার সঙ্গে মোটরের মালিকও।...নিজের মোটরের তো ওই হাল, আর ট্যাক্সির তো কথাই নেই, রোজ অন্তত চারটে করে অ্যাকসিডেন্ট এই কলকাতা শহরেই হচ্ছে। এই তো গত বুধবারের আগের বুধবারে আমাদের চোখের সামনে একখানা ট্যাক্সি—

ভদ্রলোকের কথায় একটা আকস্মিক বাধা পড়িল। ওধারের বেঞ্চ হইতে একটি ভদ্রমহিলা সহসা হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সেই দিকে মনোযোগ দিলাম; "কী হল—কাঁদছেন কেন"—"কী হয়েছে মশাই?" ইত্যাদিতে অন্য সব প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল।

অনেক প্রশ্ন করিবার পর তাঁহার সঙ্গীদের কাছে জানা গেল যে, ভদ্রমহিলার একমাত্র জামাতা ট্যাক্সি ও বাসে ধাক্কা লাগিয়া সম্প্রতি প্রাণ হারাইয়াছেন। মোটর দুর্ঘটনার এই প্রত্যক্ষ স্বরূপে আমরা সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িলাম। বিরাজবাবু নিজে অনেকখানি সরিয়া বসিয়া নবাগত ভদ্রলোককে বসিবার স্থান করিয়া দিলেন।

ওধারের ভদ্রমহিলার কান্না কমিয়া আসিলে প্রায় সমস্ত গাড়ি জুড়িয়া শুরু হইল বিবিধ, বিচিত্র দুর্ঘটনার আলোচনা। নিজের জীবনে যিনি যত রকম দুর্ঘটনা

দেখিয়াছেন, তাহাই মহা উৎসাহে বর্ণনা করিতে বসিলেন। যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহারা শোনা কথাকে অলংকার দিয়া বর্ণনা করিতে বসিলেন এবং খবরের কাগজের আদ্যশ্রাদ্ধ হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে আমাদের নবাগত ভদ্রলোকটির বিড়ি টানা শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে আর সকলের কথা ডুবাইয়া পুনশ্চ কহিলেন, কোন্ যানবাহনটা নিরাপদ? সাইকেল? শহরে সাইকেল চালানো তো প্রাণ হাতে করে, এই বুঝি ট্রামের সঙ্গে ধাক্কা লাগল, ওই বুঝি বাস চাপা পড়লুম, সর্বদা এই ভয়। ঘোড়ার গাড়ির তো কথাই নেই, ঘোড়া খেপে উঠলেই চোখে অন্ধকার। প্রভাত মুখুজ্জে, কি অনুরূপা দেবীর গল্পের নায়ক যদি কাছাকাছি থাকে তবেই রক্ষে, রাশ টেনে ঘোড়াকে আটকাবে (যদি গাড়িতে নায়িকা হবার উপযুক্ত কেউ থাকে), নইলে সটান নিমতলার ঘাটে।

এক অর্বাচীন বালক বলিয়া ফেলিল, আগেরকার হেঁটে যাওয়াই ছিল ভালো।

— ওরে বাবা! বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় তো পদচারীদের স্থানই নেই। ট্রাম-বাস-মোটর-ঘোড়া এসব তো আছেই, মায় রিকশা চাপা পড়া পর্যন্ত, আর যেখানে গাড়ি-ঘোড়া নেই সেখানে সাপ-খোপ আছে।

সম্মুখের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ফোঁস করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাইরে বেরোলেই অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কা, তার চেয়ে ঘরে বসে থাকাই ভালো।

—কিছু না, কিছু না, দেখলেন তো বিহারের ভূমিকম্পের সময়? যারা বাইরে টাইরে ছিল তারা বরং এক রকম করে বেঁচেছে, যারা ঘরের মধ্যে ছিল, তাদের তো আর চিহ্ন রইল না। আমাদেরই এক আলাপী ভদ্রলোকের কী হল—তিনি আর তাঁর নাতনি বাইরের রাস্তায় পায়চারি করছিলেন;আর বাড়ির প্রায় সবাই ছিল ভেতরে। মশাই—সেই একুশজন লোকের মধ্যে একজনও বাঁচল না। শুধু বুড়ো আর সেই নাতনি! বুড়ো তো পাগল হয়ে গেছে—

মথুরাযাত্রী ভদ্রলোকটি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ভ্যাঁক করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, মশাই, তাহলে কী আর কোনো উপায় নেই?

নবাগত ভদ্রলোকটি চিন্তিত মুখে কহিলেন, নাঃ—অ্যাকসিডেন্টের হাত এড়াবার কোনো উপায় নেই। তবে যদি অল্প স্বল্প কিছু হয় কিংবা পরিবারদের কোনো ব্যবস্থা করতে চান তাহলে উপায় আছে বটে।

চারিদিক হইতে ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন আসিতে লাগিল, কী রকম, কী রকম?

কী বললেন মশাই? ইত্যাদি।

ভদ্রলোক কহিলেন, আজকাল সব বিলিতি ইনসিওরেন্স কোম্পানিই অ্যাকসিডেন্ট ইনসিওরেন্স করছে, সেগুলো মন্দ নয়। যদি হাত-পা ভাঙে কিংবা একেবারে মারা যান তাহলে মোটা টাকা দেবে, আর যদি অসুখ-বিসুখ করে তাহলেও মাসোহারা দেবে—ভারী চমৎকার পলিসি। আমার কাছেও আছে একটা প্রসপেক্টাস, দেখবেন? স্কট্স্ ইউনিয়নের অ্যাকসিডেন্ট পলিসি, নামকরা পলিসি; অনেক পুরোনো কোম্পানি, প্রায় একশো বছরের—দেখবেন?

ভয়ের পরিবর্তে অনেকেরই মুখে-চোখে ক্রোধের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। একজন তো স্পষ্টই বলিয়া ফেলিল, ও; আপনি এজেন্ট বুঝি? তাইতো অত ভয় দেখাচ্ছিলেন?

ভদ্রলোক এই দোষারোপে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ধীরে সুস্থ স্যুটকেস খুলিয়া কতকগুলি কাগজ-পত্র বাহির করিয়া কহিলেন, আজ্ঞে ভয় তো আর আমি মিথ্যে করে দেখাইনি। কোন্ কথাটা ওর মধ্যে বাজে? ... হাত-পা ভেঙে যখন বাড়িতে এসে বসবেন, তখন যদি টাকাটা পান সেটা ভালো, না ভিক্ষে করা ভালো? নাকি আপনি টাকাটা পেলে আমায় দেবেন?

তারপর প্রশান্তভাবে মথুরাযাত্রী ভদ্রলোকের হাতে একখানা প্রসপেক্টাস দিয়া কহিলেন, দেখুন, ভালো করে পড়ে দেখুন, বুঝতে না পারলে বরং আমায় বলবেন, বুঝিয়ে দেব—

যে ভদ্রলোক কনুই টানিয়া লইয়াছিলেন, তিনি পুনরায় জানলায় হাত বাহির করিয়া বসিলেন।

বুড়া দেবতা এবং মাচাং

ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য

বড়োমুড়ার মাথা জুড়ে এক তান্ডব আকাশ আর টিলার ফাঁকফোকর দুরন্ত ছুটে আসা মেঘের চাপে একাকার। সোঁ সোঁ বাতাস, গাছগাছালি, টিলা সব কিছু ভেঙে নিয়ে যাবে। ঘূর্ণি একটা পাক নীচ থেকে ঘুরতে ঘুরতে টিলার গা বেয়ে উঠে আসে। অজস্র বৃক্ষের ডালপালা ভাঙে, উড়ে যায়। একহাত দূরের কিছু ঠাহর হয় না। বাতাসটা একটু দম নেয়, তো বৃষ্টি। আবার বৃষ্টিকে ঝাপটা মেরে উড়িয়ে নিয়ে যায় দূর থেকে দূরে বাতাস।

শত্রুঘ্নের পুরোনো মাচাংটা কাঁপে। কয়েকটা খরা-বর্ষা গেল আর কিছু করেনি শত্রুঘ্ন। ছনের ছাউনির ভেতর দিয়ে আকাশ দেখা যায়, রোদ আসে। দীর্ঘ খরার পর আকাশ ভেঙে যখন বৃষ্টি তখন জীর্ণ এই মাচাং—ক্যাচ্ ক্যাচ্ করে। তবে, কোনো পৃথক শব্দ নেই—অগুনতি গাছে গাছে প্রচন্ড ক্রোধ যেন জমা, পাতায় পাতায় তীব্র সব শব্দ শত্রুঘ্নের জীর্ণ মাচার শব্দ কোনো পৃথক কিছু নয়। ছানি পড়া চোখ নিয়ে শত্রুঘ্ন আর তাকায় না এখন। পাতা দুটো বুজে রাখে—অবশ্য খোলা-বোজা বেবাক সমান—খুলে রাখলে ঝাপসা কিছু নড়ে চড়ে, বরং বুজে রাখলে অনেক অনেক ছবি ভাসে। তাই প্রায় সময়ই শত্রুঘ্ন চোখ দুটো বুজে রাখে। ঝড়, বৃষ্টি চোখে ঠিক দেখে না—দেখারও নয়—শত্রুঘ্ন ভেতরে দেখে। গাছের এক-একটা মাথা নাড়ে, বিরাট হাতির মতো কিন্তু কেমন হালকা—কড়্ কড়্ করে বাজ পড়া গাছ কেমন খাঁড়া মরার মতো দাঁড়িয়ে থাকে—যেমন শত্রুঘ্ন। এসব উপমা শত্রুঘ্নের পাতানো নয়—জীবন তো এরকমই। জীবনটাই উপমার মতো। ভাঙা, ভাঙা খুচরো সব। ছেঁড়া পাতা, উড়ে যাওয়া পাতার মতো। গাছে যতক্ষণ, ততক্ষণ কত নাচন—সেই সবুজ সবুজ পাতার ফাঁকে পাখি, পাখিরা গান গায়, হুস করে উড়ে যায়, আবার, আবার আসে। অথচ পাতা যখন শুকায়, কোন্ অজান্তে গাছ থেকে টুপ্ করে মাটিতে, কেউ জানে না—কোন্ গাছের পাতা—এমনকি দাঁড়ানো গাছটাও নয়—জীবন তো উপমার মতোই।

দোল খাওয়া মাচাংটার এক কোনায় শত্রুঘ্ন বসে থাকে। বাতাসের দুরন্ত এক এক ঝাপটায় মাচাটা দোলে, শত্রুঘ্নও দোলে। বৃষ্টির জল ভেতরে। শত্রুঘ্ন ছাড়া এই মাচাং-এ ভেজার মতো কিইবা আছে! মাচায় মাচায় শত্রুঘ্নদের কিছু থাকে না। যেন কিছু থাকতে নেই। ঢেউ খেলানো জমি, সেই সব জমিতে নামহীন, গোত্রহীন গাছ, এবং শত্রুঘ্ন—না, তাই-বা কোথায়—কোলাহল তো দূরের হাঁট থেকে টিলার বুকের ভেতরেও ছড়িয়ে যায়। সেই সব টিলা, যার গায়ে-পিঠে শত্রুঘ্নের ফসল ফলত জুমে জুমে, তা-ও সব এখন রিজার্ভ। সব বন বাবুদের । শত্রুঘ্ন সেখায় পায়ে চলা পথের ঘাস ছোলার টিলার পিঠ থেকে—যেভাবে পশুর চামড়া ছাড়াত একদিন।

বাতাস আর বৃষ্টির দোলায় শত্রুঘ্নের পুরোনো মাচাটা দোলে। কোলে নেওয়া মুংলির মতো। আদর করতে যেভাবে নাচাত একদিন শত্রুঘ্ন— উপরের দিকে ছুড়ে দিয়ে আবার বুকে টেনে নিত—অনেকটা সেইভাবে—ভয়ংকর এই ঝড়ের ভেতরে জীর্ণ মাচাং-এ বসে বসে শত্রুঘ্নের যেন কেমন মনে হয়। যেন সে এক অনেক দিন আগের ছোট্ট হয়ে যাওয়া মুংলি। অথবা সে যেন আরেক ছোট্ট হয়ে যাওয়া শত্রুঘ্ন।

বাতাসও থামে, বৃষ্টিও। থামতে হয়। এক আকাশ গাঢ় মেঘ উপরে। দলিত মথিত করা টিলার মাথায় মাথায় গাছ, আর কিছু ঘরবাড়ি। দূরে দূরে। তবু, এই বৎসরের প্রথম বর্ষণ। এই বর্ষণে মাটি বড়ো ভালোবাসার। মেয়েমানুষদের মতো নরম। এখন, মাটির বুকের ভেতর থেকে লুকানো সব বীজ সবুজ সবুজ হয়ে মাথা তুলবে। তারপর হবে ধান, কার্পাস, কুমড়ো। জুম ভরে যাবে। শত্রুঘ্নের অকস্মাৎ মনে হয়—কোথায় জুম? জুম কোথায়? সব তো রিজার্ভ! আর উপরে এগিয়ে আসছে শহর!

কত হাঁটের দোকান-পাটের চেহারাই বদলে গেছে। সন্ধ্যা রাতেও কেবল গান গায় কী যেন এক যন্ত্রে। ভয় করে। শত্রুঘ্নের ভীষণ ভয় করে। শহর তাকে কী প্রচণ্ড এক যন্ত্রণায় গিলে গিলে খেয়ে ফেলেছে। জুমের ফসল বেচা টাকা, ধান বেচা টাকা—সে শহরে দিনের পর দিন পাঠিয়েছে—টাকা শহর থেকে নিয়েছে —মুংলা আসেনি। সেই থেকে শহরের টাকার প্রতি তীব্র এক ক্রোধ। সব বাবু! 'বাবু' শব্দটা যখন বিড় বিড় করে এই বৃদ্ধ শত্রুঘ্ন তখন তাঁর আর দশটা বিড়বিড়ানির সাথে মিশে যায় বলে কোনো নতুন কিছু মনে হয় না। কিন্তু যা মুখ ফুটে বেরোয় তার চেয়ে অনেক বেশি যে ভেতরে লুকিয়ে থাকে। আর তা কেটে কেটে যায়। এই যে খানিক আগে—কী প্রচণ্ড ঝড়, কী তীব্র বৃষ্টি হয়ে গেল—শত্রুঘ্ন চোখ বুজে যা দেখছে চোখ খোলা থাকলে তা দেখতে পারত না। তা দেখতে পারত না।

দক্ষিণের আকাশ থেকে, পশ্চিমের আকাশ থেকে ছুটে ছুটে আসে মেঘ—মেঘের সাথে পাল্লা দিয়ে একদিন এক টিলার মাথা থেকে আর-এক টিলায় দৌড়ে যেত শত্রুঘ্ন—তখন বড়োমুড়ায় শেকল পড়েনি—কী জানি কী সব করে—মটির ভেতর থেকে নাকি তেল না ছাই—বেরোবে—এখন মেঘগুলোও বোধহয় থমকে থমকে আসে। এখন কি আর টিলায় টিলায় মেঘের দুরন্ত ছুটে আসার সাথে কোনো শত্রুঘ্ন পাল্লা নিয়ে দৌড়ায় নগ্ন শরীরে—পাখির সুরেলা চিৎকারের মতো এক উল্লাস ধ্বনিতে? শত্রুঘ্ন জানে না। কেমন যেন প্রাণহীন সব। কেমন যেন সব অদ্ভুত ঠেকে।

কোথায় নাকি নতুন করে ধর্মঘট হয়। এই তো শত্রুঘ্নের টিলার ওপাশে। ঢং ঢং ঘন্টা বাজে। সব নাকি সাহেব হয়ে যাবে। এইসব ছাইপাশ—গড়িয়া, মমিতা—এইসব আর নয়—সব সাহেব হবে—স্বয়ং ঈশ্বর নাকি কথা বলে! ছুট করে কোথায় শিলং-এ নাকি চলে গেছে ওই টিলার ভাগ্যবন্ত রিয়াং-এর ছেলেটা। সাহেব বাবুরা পড়াতে নিয়ে গেছে। এক সাহেব বানাতে। শত্রুঘ্ন তার মাচার জীর্ণ কোণটায় বসে ভেবেছে আর আসবে না। পাহাড়ে ফিরে আসবে না। শিলংই যাক, আর আগরতলার রাজার ইস্কুলেই যাক। আসবে না। আসবে কেন? সব বাবু, সব সাহেব হবে। বাঁশ বেচার টাকা আর যে নেই। সমস্ত টিলা যেন মরা মায়ের স্তনের মতো। এক ফোঁটা দুধ নেই, কে আর খবর নেবে?

শত্রুঘ্ন নড়ে না। ঝড় থেমে গেছে, বৃষ্টি নেমে গেছে। এই বৃদ্ধ অভিমানী নিঃসঙ্গ এক টিলার বুকে আরও নিঃসঙ্গ এক প্রহরীর মতো বসে থাকে। মেঘ জমে থাকে আকাশে। এক চাপ, দুই চাপ। চাপের পর চাপ। বিকেলের আর সন্ধ্যার ফাঁকটুকু কখন একাকার হয়ে চরাচর থেকে রাত নামে। শেয়াল ছাড়া আর কেউ পাহাড়েও ডাকে না—কেন না, পশুরাও নেই। দূর থেকে, কাছ থেকে কিছু শেয়াল ডাকে, ডাকে আরও কিছু নামগোত্রহীন পাখি-পশু। শত্রুঘ্ন দাঁড়ায় না, নড়ে না।

এবার সে আকাশের দিকে চোখ তোলে। এতক্ষণ যেন বসে বসে ঘুমোচ্ছিল। অথবা ঘুমাতে ঘুমাতেই বসেছিল। যদিও এই তার অপেক্ষা। যত কিছু থাক—একটা অপেক্ষা—কেন জানি শত্রুঘ্নের মনে হয় এইভাবে চলে না, চলতে পারে না। টিলা বাইতে বাইতে একটা বিরাট খাড়াই তারপর নামা—কেমন ঢাল। তর তর করে নেমে যাওয়া। এই চড়াই—ঢাল, ঢাল—চড়াই করতে করতেই পাহাড়, হাট, গ্রাম, গঞ্জ, শহর আগরতলা। এটা ঠিক—কিন্তু ওইভাবে ফিরে এলে তো এই টিলাই। শত্রুঘ্ন গেছে—এইভাবে, নিয়ে এসেছে এইভাবে। কিন্তু মুংলি তো এল না। ও কি তবে বাবু হতে গেল? শত্রুঘ্ন জানে না।

রাতে কবে আর আগুন জ্বালে শত্রুঘ্ন। জ্বেলে কী হবে? বরং নিদ্রাহীন শত্রুঘ্ন বড়োমুড়ার এই টিলার শীর্ষদেশে বসে তাকিয়ে থাকে—অজস্র রাত্রির চেহারা দেখে। এক-একটা রাত্তিরের এক-এক রকম মুখ। কোনোটা মুংলির মা-র মতো—আবছা, কোনোটা গভীর খাদের মতো কদাকার, কোনোটা যেন ফসলের দোলা খাওয়া জুমের টিলার মতো। হাসি আসে! তখন নানা রেখায় কুঞ্চিত শত্রুঘ্নের মুখমন্ডলে কেমন এক হাসি! কেউ দেখে না। কেন-না, কেউ নেই—এবং আছে চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। আলো আজও জ্বালায় না। এই কোনাটায় বসে থাকে। একটি অংশ আগের প্রথম বৈশাখী নিয়ে গেল। দুমড়ে পড়ে আছে। সবটাকে একেবারে নিল না—একটি অংশ নিয়ে গেল! এখন জানান দিয়ে যাওয়া। শত্রুঘ্ন তো প্রস্তুত। সেই কবে থেকে।

কিন্তু তার রক্তের মধ্যে যেন এক পাগলা বাজনার দোলা। মৃত্যুর বিলাসিতা করার মতো শৌখিনতা তার কোথায়? এসব তো শত্রুঘ্নদের নয়। একটা ঝট্‌কা যেন এই বৈশাখীর প্রথম আবির্ভাবে বৃদ্ধ শত্রুঘ্নকে ছুঁয়ে যায়। সারা রাত বসে বসে ভাবে। একটা নিমেষের জন্য প্রায় সমবয়সি মাচাংটায় এই বৃদ্ধ আজ দেহটাকে টান করে না। পা দুটোতে তার যেন এক কেমন চঞ্চলতা। শিরায় শিরায় রক্ত যেন অকস্মাৎ বহুগুণ বেগে ধায়।

সূর্য তখনও ফোটেনি আকাশে। কেবল লাল লাল একটা আভা। এক-একটা টিলার মাথায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে সূর্য উঠে আসছে। ছানি পড়া চোখ দুটো টান টান করে বহু বছর পর শত্রুঘ্ন আজ দেখে—একটা কেমন রং ছড়ায়। কিছু পাখি—জেগে গেছে, শেয়ালরা এবার চুপ করে গেছে একটা শুনসান বাতাস—পাতায় পাতায় সে বাতাসে শব্দ হয়—বাঁশের ঝাড়টায় ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ, তবে একটু ঢিমে তালে—সূর্য উঠে আসছে—শত্রুঘ্ন তার সেই কোনাটা ছেড়ে এবার উঠে দাঁড়ায়।

হারবার আগে—একবার জবাব চায় শত্রুঘ্ন—সে যাবে—ওই শহরের দিকে—এবার সমস্ত রাগ, অভিমান ছেড়ে—সোজা গিয়ে দাঁড়বে—মুংলার কাছে—গিয়ে বলবে—মুংলাবাবু, তুই যাস্, আর না যাস্—বড়োমুড়ায়—এখনও সূর্য ওঠে।

এই একটি মাত্র কথা বলে শত্রুঘ্ন ফিরে আসবে।

টিলার বুক থেকে মাচাংটাকে পিছনে ফেলে বৃদ্ধ তার যাবতীয় শক্তিকে একত্রিত করে হাঁটতে চাইছে—শহরের দিকে সে যাবেই—

একপদীকরণ (নির্বাচিত ৮০টি)

১. অগ্রে গমন করে যে— অগ্রগামী
২. অতিক্রম করা অসাধ্য যা—অনতিক্রম্য
৩. অতি দীর্ঘ নয়— নাতিদীর্ঘ
৪. অভিনন্দনসহ ভাষণ— সম্ভাষণ
৫. অরিকে দমন করে যে — অরিন্দম
৬. অলংকারের ধ্বনি— শিঞ্জন
৭. অশ্বের ডাক — হ্রেষা
৮. অজানাকে জানার আগ্রহ—অনুসন্ধিৎসা
৯. অনুকরণ করবার ইচ্ছা— আনুচিকীর্ষা
১০. অনুতে (পরে) জন্মেছে যে—অনুজ
১১. অগ্রে জন্মেছে যে—অগ্রজ
১২. অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে কাজ করে যে—অবিমৃষ্যকারী
১৩. অক্ষর জ্ঞান আয়ত্তে যার— সাক্ষর
১৪. আকাশ ও পৃথিবী— ক্রন্দসী
১৫. আগে যা শোনা যায়নি— অশ্রুতপূর্ব
১৬. আগে হয়নি যা— অভূতপূর্ব
১৭. আহ্বান করছেন যিনি—আহ্বায়ক
১৮. আমৃত্যু যুদ্ধ করে যে—সংশপ্তক
১৯. আবহমানকাল ধরে প্রচলিত যা—চিরায়ত
২০. আগুনের ফুলকি—স্ফুলিঙ্গ
২১. আয় মতো যিনি ব্যয় করেন—মিতব্যয়ী
২২. ইতিহাস জানেন যিনি—ঐতিহাসিক
২৩. ইন্দ্রকে জয় করেছেন যিনি—ইন্দ্রজিৎ
২৪. ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন যিনি—জিতেন্দ্রিয়
২৫. ঈষৎ উষ্ণ—কবোষ্ণ
২৬. ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে যার—আস্তিক
২৭. ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই যার—নাস্তিক
২৮. উইয়ের ঢিবি—বল্মীক
২৯. উঁচু-নীচু স্থান—বন্ধুর
৩০. উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে — কৃতজ্ঞ
৩১. উপকার স্বীকার করে না যে— অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন
৩২. উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার--- প্রত্যুৎপন্নমতি
৩৩. উভয় হাত সমান চলে যার— সব্যসাচী
৩৪. উদ্দাম নৃত্য—তাণ্ডব
৩৫. উর্ণা নাভিতে যার—উর্ণনাভ
৩৬. ঋণ গ্রহণ করে যে—অধমর্ণ
৩৭. ঋণ দেয় যে—উত্তমর্ণ
৩৮. একান্ত গুপ্ত—সংগুপ্ত
৩৯. একবার শুনলেই যার মনে থাকে— শ্রুতিধর
৪০. এক পাড়ার লোক—পড়শি
৪১. এক কোশ জল—পাণ্ডুষ
৪২. একই গুরুর শিষ্য—সতীর্থ
৪৩. ঐক্যের অভাব—অনৈক্য
৪৪. কথায় যা প্রকাশ করা যায় না--- অনির্বচনীয়
৪৫. কুকুরের ডাক—বুক্কন
৪৬. কীর্তিতে বাস করেন যিনি—কীর্তিবাস
৪৭. কৃত্তি বাস যার—কৃত্তিবাস
৪৮. কোকিলের ডাক—কুহু
৪৯. ক্রমশ উঁচু যে পথ—চড়াই
৫০. ক্রমশ নীচু যে পথ—উতরাই
৫১. কাচের তৈরি বাড়ি — শিশমহল
৫২. কীর্তি যিনি অর্জন করেছেন—কৃতী

৫৩. কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি—অমাবস্যা
৫৪. খ(আকাশ)-এ চরে যে—খেচর
৫৫. খেয়াঘাটের মাঝি—পাটনি
৫৬. গম্ভীর ধ্বনি—নাদ
৫৭. গ্রন্থাদির অধ্যায়—পরিচ্ছেদ
৫৮. গ্রামের সমষ্টি—ডিহি
৫৯. গাছের ছাল—বল্কল, বাকল
৬০. চারদিকে জলবেষ্টিত স্থান—দ্বীপ
৬১. চলছে এমন ছবি—চলচ্চিত্র
৬২. চিরস্থায়ী যা নয়—নশ্বর
৬৩. ছিন্ন বস্ত্র—চীর
৬৪. জলময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর—হাওড়
৬৫. জল দেয় যে—জলদ
৬৬. জয়সূচক উৎসব—জয়ন্তী
৬৭. ঢাকের বাজনদার— ঢাকি
৬৮. তরল অথচ গঢ়— সান্দ্র
৬৯. তিন মাস অন্তর — ত্রৈমাসিক
৭০. দানের বিনিময়ে দান—প্রতিদান
৭১. দিনের মধ্যভাগ—মধ্যাহ্ন
৭২. ধনুকের ছিলা—জ্যা
৭৩. নাটকের পাত্রপাত্রীগণ—কুশীলব
৭৪. নতুন অন্নে যে উৎসব—নবান্ন
৭৫. পাণ্ডুর পুত্র—পাণ্ডব
৭৬. পথ চলার খরচ—পাথেয়
৭৭. বিধানসভার সদস্য যিনি—বিধায়ক
৭৮. যা বিধিসম্মত—বৈধ
৭৯. যে বেশি কথা বলে—বাচাল
৮০. হাতির ডাক—বৃংহণ, বৃংহতি